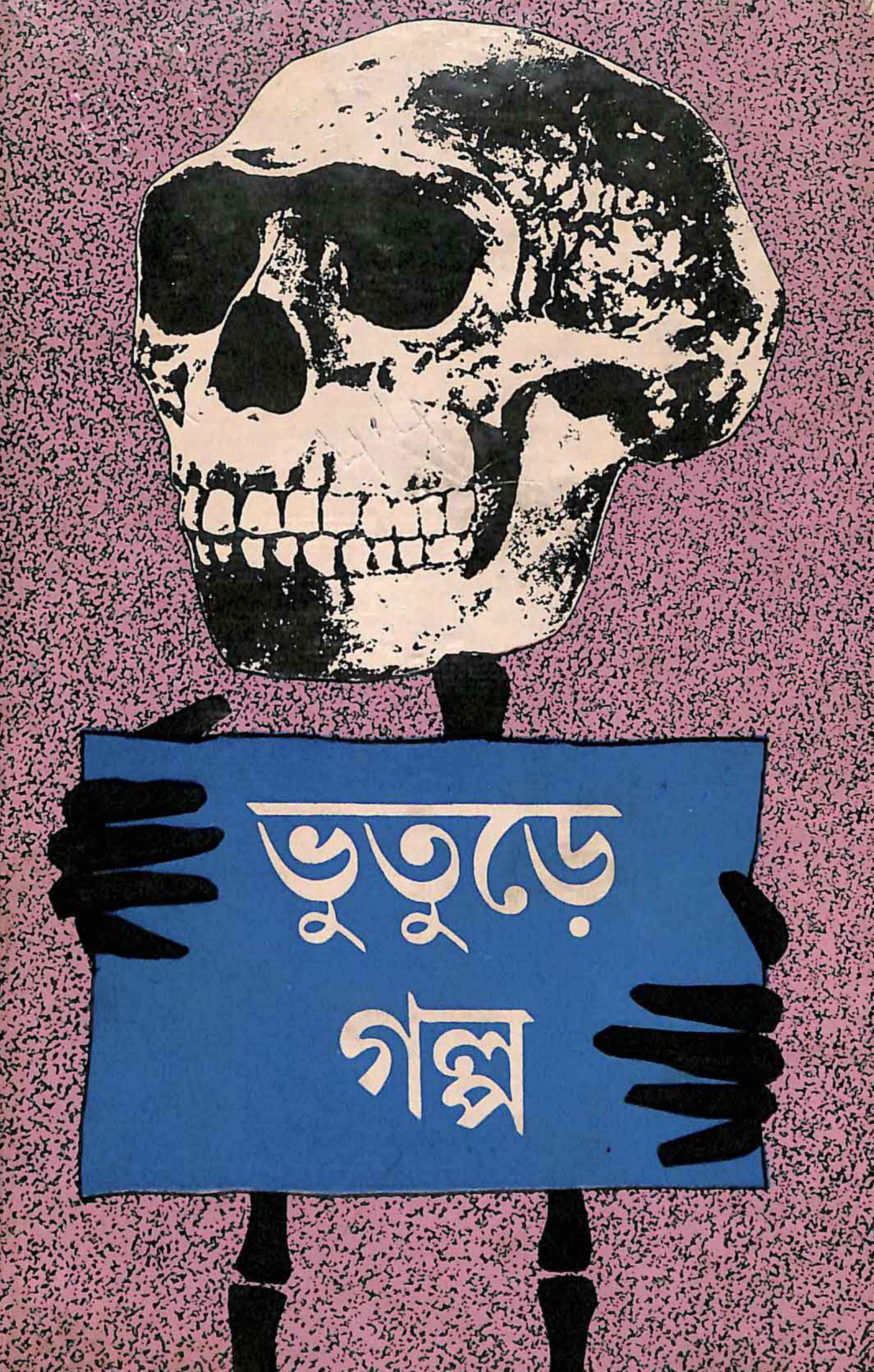

ভুতুড়ে
গল্প

ভুতুড়ে গল্প

প্রলয় সেন

পরিবেশক

উজ্জ্বল বুক স্টোরস * কলিকাতা-৬

BHUTURE GAPPO Rs. 10·00
(The Ghost Stories)
by Pralay Sen

শোভন মুদ্রণ :
আশ্বিন, ১৩৯৫
অক্টোবর, ১৯৮৮

Distributed by :
Ujjal Book Stores
Calcutta-6

প্রকাশক :
প্রবোধচন্দ্র নায়ক
প্রফুল্ল গ্রন্থাগার
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
নিউ শ্রীমা প্রেস
৬৯/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
অমিয় ভট্টাচার্য্য

দশ টাকা মাত্র

টুকুনকে—

বাবা

বিষয়সূচী

ভূতের খপ্পরে

মোড়ের মাথায় দুজনের দেখা। একেবারে মুখোমুখি। ঠিক গোধূলির সময়। অর্থাৎ সূর্যটা দূর পশ্চিমে ডুবে যাবার পর লালচে আবছায়ায়।

এই জায়গাটার নাম হোল তেঁতুলতলার মোড়। একটা পীচের রাস্তা দূর এক মফঃস্বল শহর থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল মাঠটাকে দু'ফলা করে সোজা চলে গেছে কোন এক নদীবাঁধের কাছে। আর এই রাস্তার দুই বিপরীত দিক থেকে দুটো খোওয়া ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা এসেছে এখানে। অর্থাৎ, এই মস্ত ডালপালাওলা আদ্যিকালের তেঁতুলগাছটার নিচে।

এই অঞ্চলে তেঁতুলগাছটার অল্পবিস্তর অখ্যাতি আছে। বহুকাল ধরে এই গাছটাকে নিয়ে অনেক গা-ছমছম সত্যি মিথ্যে মিশানো গালগল্প গড়ে উঠেছে একটু একটু করে। আশপাশের গাঁয়ের তেমাথা বুড়োরা বলে, এই গাছের তলায় অনেককাল আগে নাকি ছিল দক্ষিণাকালীর 'থান'। মধু বাগ্‌দী নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দলবল নিয়ে প্রতি অমাবস্যার রাতে এখান সেখান থেকে একটা করে মানুষ ধরে এনে বলি দিয়ে মায়ের পূজো করত। তারপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রণপা পরে এগাঁয়ে সে-গাঁয়ে হানা দিত। তারপর বেশ কিছুদিন গেলে, মানে মধু বাগ্‌দী মরে গিয়ে তার দল ভেঙে গেলে এই গাছতলায় আশ্রয় নেয় এক জটাধারী পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। তাকে আবার একদিন ভোরবেলা ঘাড়মটকানো অবস্থায় গাছতলায় উবু হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তারপর থেকেই গাছটা এ অঞ্চলের লোকের কাছে আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। গত বিশ বছরে, ঠিকমত খোঁজখবর নিলে জানা যাবে, এই গাছের বিভিন্ন ডালে নিশিরাতে তো কম করে ডজন দুই তিন লোক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ফলে, সন্ধ্যে হলে সাধারণ গেরস্ত লোকজন তো দূরের কথা দশ গাঁয়ের ষণ্ডামার্কা তাবড় ছেলেছোকরারা পর্যন্ত তেঁতুলগাছের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

আজকের দুজন পথিকের মধ্যে একজন বেশ ঢ্যাঙা বলেই একটু কুজো মতন। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালের ভাঁজে ঘাম জমে গিয়ে মিছরির দানার মত টসটস করছে। গর্তে বসা চোখ, চাউনি ঘোলাটে। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। বয়স মনে হয় পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে। পরনে আধময়লা ফতুয়া। বুকে বোতাম না থাকায় বুকের কাঁচা পাকা লোমশ অংশটা দেখা যাচ্ছে। পায়ে হাওয়াই চটি। গোড়ালি অবধি ধূলোর আস্তর। বাঁ কানে আধপোড়া বিড়ির টুকরো গোঁজা। কণ্ঠনালীর তেকোণা হাড়টার ঠিক নিচে কালো সুতোয় গুচ্ছের তাবিজকবচ ঝুলছে। হাতে খাকি কাপড়ের তৈরী ঢাউস থলেটা জিনিসপত্তরে ঠাসা।

দ্বিতীয় তুলনায় খাটো। তবে রীতিমত পেটানো, কেঠো শরীর। চালচলনে কেতাদুরস্ত। পরনে টেরিলিন-এর শার্ট আর কর্ডের প্যাণ্ট। ডানহাতে ঘড়ি, পায়ে কাবলি স্যাণ্ডেল, কাঁধে মাঝারি সাইজের একটা কিট্ ব্যাগ। বয়সে প্রথমজনের তুলনায় বেশ ছোট বলে মনে হয়।

তবে দুজনের মধ্যে কিছু মিল যে নেই এমন নয়। দুজনেরই চুল উস্কখুস্ক, পথশ্রমে চোখ লালচে, ধূলিধূসরিত ক্লান্ত শরীর, জামা ঘামে চটচটে, চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ।

প্রথমজন আগে মুখ খুলল, গলার স্বর মেয়েলি ধরনের। অর্থাৎ খোনা খোনা, 'মশায়ের নাম?'

'রাখাল সিকদার।'—দ্বিতীয় অর্থাৎ রাখাল সিকদার উত্তর করেই পাল্টা শুধোল, 'আপনার?'

'গজেন সোরেন।'—প্রথম অর্থাৎ গজেন জবাব দিল।

'তা, আপনি কোত্থেকে আসছেন?'—রাখাল প্রশ্ন করল।

'আমি'—পেছনে ফিরে ইউনিয়ন বোর্ডের খোয়া ওঠা রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, 'ওই পথ ধরে। গাঁয়ের নাম গাবতলি।'

'গাবতলি?'—আবছায়ায় কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। রাখাল নিরুৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে আবার কোথায়?'

'আজ্ঞে, চিলতোড় মৌজায়। এখান থেকে পাঁচ ছ' ক্রোশ

দক্ষিণে।'—শব্দ করে কণ্ঠনালীর জমা সর্দি ভেতরে টানতে গিয়ে গজেনের বুক থেকে অদ্ভুত একটা কঁকানো আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'বলেন কি মশাই।' রাখালের দু'চোখ বিস্ফারিত, 'এই কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে এতটা পথ হেঁটে আসছেন?'

'কি করব বলুন,' খুনখুনে হেসে উঠল গজেন, 'কাল রাত্তিরে ভাইঝির অসুখের খবর পেয়েছি। মা-বাপ মরা মেয়ে। গত সনে বিয়ে দিয়েছি। মা ওলাবিবির দয়া লেগেছে। খবরটা পেয়ে কি আর নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা যায়।'

'কলেরা!'—রাখাল শিউরে ওঠে, 'কি সাংঘাতিক!'

'হ্যাঁ, এ তল্লাটে ভীষণ জলকষ্ট। চোত বোশেখেই পুকুর খালবিল সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। ফিবছরই তো এ সময় ওলাবিবির জোর নজর লাগে।'—গজেন গড়গড় করে কথাগুলো বলে।

চারদিক ক্রমশ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। রাখাল ব্যাজারমুখে বলে, 'আর বলবেন না। সেই কোন্ ভোরে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরেছি। সারাটা দিন টিকিস টিকিস করে ট্রেন চলেছে। মাঝখানে আবার মাঠের মধ্যে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে ছিল। কি ব্যাপার, না লাইন ক্লিয়ার নেই। তারপর টাউনে পৌঁছে বাস ধরে এই তো সবে নামলাম। জীবনে কখনো এদিকে আসিনি। একজনের এই হেলে তেঁতুলতলায় আসার কথা। অথচ তার কোন পাত্তা নেই। এরকমটা হবে জানলে কখ্খনো আসতাম না।'

'এই হেলে তেঁতুলতলায় সাঁঝবেলায় কার আসবার কথা মশাই?' কথাটা বলতে গিয়ে ঢোঁক গেলে গজেন।

'কার আবার,' এমনিতেই ফ্যাসফ্যাসে গলা রাখালের। বিরক্তি রাগে আরো বেসুরে হয়ে ওঠে, আমার এক দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাইয়ের। নাম নিত্যানন্দ। এদিকের এক গ্রামে আমার এক পিসিমা থাকেন। তার মেয়ের কাল বিয়ে—'

হঠাৎ মাথার ওপরকার তেঁতুলগাছটার একটা ডাল ভাঙা বিকট শব্দ জেগে ওঠে।

'ওরে বাবা !'—বলে গজেন একলাফে পীচের রাস্তায় ওঠে।

আচমকা গজেনের অদ্ভুত আচরণে রাখাল হকচকিয়ে যায়। ব্যাপারটা কি হল বুঝতে না পারলেও সেও পাকা রাস্তায় উঠে পড়ে। তারপর বলে, 'কি হল মশাই, লাফ মারলেন কেন ?'

গজেন ততক্ষণে রাস্তার ওধারে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। বিষম খাবার ভঙ্গিতে উত্তর করল, 'তেঁতুলগাছটার দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারছেন না ?'

একটা ইঁটের টুকরোয় ঠোক্কর খেয়েছিল রাখাল। সে গজেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে অধৈর্য গলায় বলে, 'কি আছে গাছে ?'

'একটা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ—'

'শুনেছি।'

'কি মনে হল ?'

'কি আবার, বাহুড় কি শকুনের ডানা ঝাপটানোর শব্দটব্দ হবে—'

'হাসালেন', গজেন রীতিমত উত্তেজিত, 'পাখি ডানা ঝাপটালে অত জোরে শব্দ হয় ? এই আপনার বুদ্ধি—'

'তাহলে ?'—এবার ঘাবড়ায় রাখাল। হাতে দামী ঘড়ি। কিট্‌ ব্যাগের ভেতর হাজার টাকায় কেনা একটা বেনারসী শাড়ি আর একটা বিদেশী ক্যামেরা। অচেনা জায়গা। গত ডিসেম্বরের শেষাশেষি নিত্যানন্দ তাদের কলকাতার বাড়িতে এসেছিল। তখনই শুনেছে রাখাল—এধারে নাকি কয়েক বছর ধরে ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়ের উপদ্রব চলছে।

'তাহলে আর কি !'—বেজায় ভয় পাওয়ায় গজেনের মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে, 'এই তেঁতুল গাছটা সম্বন্ধে আপনি কিছু শোনেননি ?'

আকাশজুড়ে আবছায়ার হাল্কা শামিয়ানা পেতে দিয়েছে কেউ। কাছেপিটে জন-মানবের সাড়া নেই। শুধু থমথমে নীরবতার মাঝখানে তেঁতুলগাছের কয়েকটা ডাল এক নাগাড়ে নড়ছে।

'ওই তো, শুনুন, একটা কান্নার আওয়াজ—,' গজেন কথা শেষ করতে পারে না।

রাখাল কান খাড়া করে। খানিকটা সময় নিয়ে বলে, 'আমার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। বোবহয় পাখির ছানা কঁকাচ্ছে—'

গজেন মুখ ভেংচায়, ঠিক বুঝবেন, 'যখন ঘাড় মটকাবে—'

হঠাৎ রাখালের খেয়াল হল পুব দিগন্ত থেকে একখণ্ড বিরাট ভালুকে মেঘ হামা দিয়ে গুটিগুটি মাঠের মধ্যিখানে এগিয়ে আসছে। রাখাল তেতে ওঠে, 'কে ঘাড় মটকাবে ! আপনি কি যা-তা বলছেন—'

'কে আবার, আপনার সুমুন্দি। অপেক্ষা করুন, টের পাবেন। আমি চলি—,' বলে পুবমুখো হাঁটতে শুরু করে গজেন।

এবার একটু ভড়কে যায় রাখাল, কলকাতার শহরের লেখাপড়া জানা মানুষ হলেও। গাঢ় অন্ধকারে অর্ধেক আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে। এই অপরিচিত উদোম ধূ ধূ মাঠের ভেতর গজেন চলে গেলে তার সমূহ বিপদ। অতএব রাখাল গলার স্বর যথাসম্ভব নরম করে বলে, 'আরে মশাই, রাগ করছেন কেন। আমি কি এ তল্লাটের লোক, এদিকের কিছু কি জানি ছাই !'

গজেন ততক্ষণে পুব দিকের মেঠো রাস্তায় নেমে পড়েছে। রাখালের কাতর আহ্বানে গেঁয়োমানুষটার রাগ জল হয়। সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'তাহলে ভাল ছেলের মত পা চালিয়ে এগিয়ে আসুন।'

মুহূর্তের দ্বিধা রাখালের। নিত্যানন্দ এল না তার গন্তব্যস্থল কুসুমগ্রাম। ওই গ্রামে তার পিসিমার বাড়ি। গজেন কোনদিকে যাবে সে জানে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো গ্রাম। কিন্তু এই লোকালয়হীন ধূধূ অন্ধকার মাঠে আর কতক্ষণই বা সে অপেক্ষা করবে নিত্যানন্দর জন্য। শেষমেষ যদি না আসে ! তার চেয়ে বরং গজেনের সঙ্গী হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যেখানেই হোক, আজ রাতের মত এতটা আশ্রয় তো পাওয়া যাবে।

অগত্যা পুবের মেঠো রাস্তায় নেমে পড়ে রাখাল। গজেনের কাছাকাছি পৌঁছে শুধোয়, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'কুসুমগ্রামে।'

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার গল্প শুনেছে রাখাল এতদিন। কিন্তু

এই মুহূর্তে গজেনের কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি সে যেন চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে। সে বলে, 'আমিও তো কুসুমগ্রাম যাব। দেখুন তো, কি যোগাযোগ—'

'বটে! তা কার বাড়ি যাবেন?'—গজেনের গলা বেসুরো হয়ে ওঠে।

চক্রবর্তী বাড়ি। আপনার পিসেমশাইর নাম সীতানাথ চক্রবর্তী।

'সীতানাথবাবু, টাউনে মোক্তারি করতেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি চেনেন নাকি?'

'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তবে নামকরা লোক। এ তল্লাটের কে না চেনে ওকে। ওদের ভিটেবাড়ি ছাড়ালেই তো আমার ভাইঝির শ্বশুরের ঘর—'

কিছুটা পথ এগুবার পর চতুর্থীর ক্ষয়াটে চাঁদ সমেত গোটা আকাশটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। দেখতে দেখতে পুরু কালো মেঘের তেরপলের নিচের পৃথিবীটা আরো নিশুতি হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে শুরু হল দমকা বাতাসের লম্ফঝম্প। টর্চ আনতে ভুলে গেছে রাখাল। নিজের এই আহাম্মকির জন্য নিজেকেই সে মনে মনে ধমকাল। অবশ্য এরকম বিপাকে পড়বে তা কি সে জানত? নিত্যানন্দ এভাবে বেইমানি করবে রাখাল ভাবতে পারেনি। মেঠো অন্ধকার পথ। মাঝে মাঝে আবার গাড়া। অনভ্যস্ত, শহুরে মানুষ, হাঁটতে বেজায় কষ্ট হচ্ছিল তার। এক সময় সে নিত্যানন্দর মুণ্ডুপাত করতে শুরু করল।

খানিক বাদে ভাব জমাবার জন্য রাখাল বলল, 'আচ্ছা গজেনবাবু, তেঁতুলগাছটায় তাহলে কিসের শব্দ হচ্ছিল বলে আপনার মনে হয়?'

গজেন গাঁয়ের লোক। সে দিব্য তরতর করে এগোচ্ছিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছিয়ে পড়া রাখালের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'সাঁঝের বেলায় ভূত পেত্‌নির দল মানুষ দেখে নেত্য করছিল, এই আর কি—

দুধারে শূন্য খাঁ-খাঁ মাঠ। মাঝে মাঝে খোয়াই। কোথাও

আবার খানিকটা জায়গা জুড়ে লাঙ্কা, বুনো কুল কিংবা কাঁটা বাব্‌লার ঝোপ।

'ভূত!'—মনে মনে হেসে ওঠে রাখাল। গাঁয়ের লোকের কুসংস্কার ছাড়া আর কি। গজেনকে উসকে দেবার জন্য নাটুকে গলায় সে প্রশ্ন করে, 'বলেন কি মশাই! তেঁতুল গাছটা কি ভূতের আড়ত নাকি?'

'হ্যাঁ!'—গলা কেঁপে উঠলেও গজেন এতক্ষণ পেটের ভেতর জমে ওঠা কথাগুলো উদ্‌গার করার সুযোগ পায়, 'শাকচুন্নি কন্দকাটা ব্রহ্মদৈত্য এমন কি মামদো পর্যন্ত। এই তো তিনমাস আগের কথা! ভাইঝিকে দেখতে এসে আমিই তেনাদের খপ্পরে পড়েছিলাম। সে কি হেনেস্থা মশাই—'

'কি রকম?'—হাওয়ায় ক্রমশ জোলো ভাব বাড়ছিল। কাজলি-ছাই অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। প্রশ্নটা করার সময়ে রাখালের শরীর ঈষৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে।

'তখনো জানতুম না ওই গাছে তেনাদের বাসা। সেদিনও ছিল এরকম ঘোর সন্ধ্যা। তেঁতুলতলার মোড় ছাড়িয়ে এদিকের মেঠো পথে সবে নেমেছি, হঠাৎ কাঁধটা ভার ভার ঠেকতে লাগলো। প্রথমে ভাবলুম, অনেকটা পথ হাঁটছি তাই বুঝি শরীরটা—'

'তারপর?'—রাখাল গজেনের সঙ্গে ব্যবধানটা ঘোচাবার জন্য জোরে পা চালাল।

'কি আর করি,—জানি না কি ভূত, ব্রহ্মদৈত্য না পেত্‌নী, গলা ছেড়ে রাম নাম করতে লাগলুম।'—গড়গড় করে বলে চলেছে গজেন, 'একসময় মালুম হল দেহটা আর বইতে পারছি না, মনে হচ্ছে আমার কাঁধে যেন কেউ কুড়ি পালি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আসলে এক শাকচুন্নি তেঁতুলগাছ থেকে লাফিয়ে আমার কাঁধে চেপে বসেছিল। আর কিছুটা সময় গেলেই ফাঁকা মাঠের ভেতর বেটি ঠেসে ধরে ঘাড় মটকে আমায় নিকেশ করে দিত।'

'বলেন কি!'—এতক্ষণ রাখালের গলার স্বর বেসুরো হয়ে ওঠে।

'বরাত ভাল, তাই সে যাত্রা রক্ষে পেয়ে গিয়েছিলুম। ঠিক সেই সময় একদল চাষী মাঠে নিড়েন দিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছিল। তাদের সাড়া পেয়ে ব্যাটাচ্ছুড়ি আমার কাঁধ থেকে নেমে শ্মশানপানে চম্পট দিল—'

'শ্মশান!'—রাখালের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে, 'সে আবার কোথায়?'

'কুসুমগ্রামের কিছু আগে। এক মরা সোঁতা আছে, তার ধারে—'

'কিন্তু গাছটায় অত ভূত থাকতে শাকচুন্নিটাই বা কেন আপনার পেছু নিল?'

'আরে, আমার সঙ্গে একটা জিওল মাছের মেঠে হাঁড়ি ছিল যে! ভাইঝি মাগুরমাছ খুব ভালোবাসে। এধারে মাছের আক্রা। তাই নিয়ে যাচ্ছিলুম—'

'তা চাষীদের দেখে শাকচুন্নিটা পালিয়ে গেল কেন?'—বিষয়টা ক্রমশ উত্তেজক হয়ে উঠছিল। তাই রাখালের কৌতূহলও বাড়তে থাকে।

'এই তো মজা, ভূতেদের এই রকমই ধারা। আসলে তেনারা বেজায় ভিতু। একাচোরা না পেলে দেখা দেন না—'

কথাটা শুনে রাখাল আশ্বস্ত হয়। সে খুশি হয়ে বলে, 'তাহলে আমাদের কোন ভয় নেই, কি বলেন গজেনবাবু, আমাদের সঙ্গে আজ মাছটাছ নেই, তাছাড়া যখন দুজন আছি—'

'তা অবশ্য ঠিক। তবে কাছেভিতে কোন লোকালয় নেই, এই ফাঁকা অন্ধকার মাঠে—'

'কি বলতে চাইছেন খুলে বলুন না মশাই।' রাখাল অধৈর্য হয়ে ওঠে।

'অনেক সময়—,' আমতা আমতা করে বলে গজেন, 'মানুষের রূপ ধরে তেনারা পথ-চলতি লোকের সঙ্গ দেয়। তারপর—'

'তারপর?'—এতক্ষণে রাখালের শরীরে কাঁটা দেয়।

'তারপর আর কি, ভুজুং ভাজুং দিয়ে শ্মশানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে শেষ করে।'

গজেনের কথা শেষ হতেই বাঁ দিকের কাঁটাবাবলার ঝোপে খসখস শব্দ জেগে ওঠে। তারপর হঠাৎ দেখা যায়, ঝোপটার পাশ থেকে চার পেয়ে মাঝারি সাইজের জন্তু ধাঁ শব্দে একলাফে মেঠো রাস্তায় উঠে আসে।

গজেন রাখাল দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ে। উফ্, কি ধকধকে হলদেটে দৃষ্টি জন্তুটার। আর মুখে, শিউরে ওঠে ওরা, অন্ধকারেও বোঝা যায় জন্তুটা মানুষের একটা আস্ত হাত মুখে কামড়ে ধরে আছে।

রাখাল আর ঠিক থাকতে পারে না। 'বাবাগো বলে ফ্যাসফেসে স্বরে ককিয়ে উঠে গজেনকে জাপটে ধরে। ওদিকে বিদ্ঘুটে জন্তু তাদের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে এক সময় লাফিয়ে উল্টো দিকের লাক্ষার জঙ্গলে সেঁধিয়ে যায়।

গজেন খোনা গলায় বিকট ধমকে উঠে বলে, 'আহ্ কি হচ্ছে, ছাড়ুন বলছি। আপনার ধাক্কায় আমার থলেটা যে পড়ে গেল—'

রাখাল ফোঁস ফোঁস শব্দে নিশ্বাস ছাড়ছিল। বলে অসহায়ের মত, 'কি করব বলুন, দেখলেন না একটা বিভৎস জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'ওটা তো শেয়াল। শেয়াল দেখে ভয় পাবার কি আছে? আপনি কি কচি খোকা। যত সব—'

'শেয়াল না হয় মানলাম। কিন্তু ওটার মুখে যে জিনিষটা ছিল সেটা ভাল করে দেখেছেন কি?'

'কি আবার, মানুষের হাত।' গজেন ভয় পেয়ে গেলেও বলেই চলে, 'এটা সুখা তল্লাট। এখানে কাঠের খুব অভাব। তাই গরীব-গুর্বো মারা গেলে আত্মীয়স্বজনেরা মড়ার মুখে নুড়ো জ্বালিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়ে চলে যায়। শেয়ালটা তক্কে তক্কে ছিল। সন্ধ্যা নামতেই গর্ত খুঁড়ে এমনি এক মড়ার হাতটা ছিড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

বাতাস কালনাগিনীর মত ফুঁসছে। বৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। মিশকালো আকাশটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে।

রাগে গজগজ করতে করতে গজেন লাঙ্কার জঙ্গলের দিকে নেমে যায়। খানিকক্ষণ চুপচাপ। গজেনকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎই একটা ভয় রাখালকে পলকাগাছের মত নাড়িয়ে দেয়। তবে কি গজেন মানুষের রূপ ধরে হেলে তেঁতুলতলার মোড় থেকে··· । তার মাথার ভেতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরপাক খেতে থাকে।

খানিক বাদে গজেন ফের থলে হাতে রাস্তায় উঠে আসে। ফের ধমকের সুরে বলে, 'আপনি তো আচ্ছা ভদ্দরলোক। এর মধ্যে কত কি দরকারি জিনিস আছে জানেন ?'

থলেতে কি আছে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই রাখালের। সে ধমকটা হজম করে গজেনের পেছু নেয়। ঘোর বিপদ, তবু ওকে এড়িয়ে সে যাবে কোন্ চুলোয়। দুধারে জলকাদা, ঝোপজঙ্গল মাঠ। কুসুমগ্রাম কোন্দিকে জানা নেই। কোন্ দিকে ছুটবে। একমাত্র ঘুরে উল্টোমুখো ছুটতে পারে। কিন্তু সেটা হবে আরো আহাম্মকি। কেননা, তাহলে সে ফের ওই হেলে তেঁতুলতলার মোড়ে পৌঁছুবে। যেখানে তেনাদের আড়ত।

গজেন ঢ্যাঙা লম্বা পা ফেলে এগুচ্ছে। ফের দুজনের ব্যবধান একটু একটু করে বাড়ে। লোকটা যখন শেয়ালটাকে দেখে, ভাবতে শুরু করেছে গজেন, দৌড়ে এসে তাকে জাপটে ধরে। তখন সে কি টের পেয়েছিল। মনে হয়েছিল রাখালের শরীর বেজায় ঠাণ্ডা। জ্যান্ত মানুষ এত ঠাণ্ডা হয়! তাছাড়া মানুষের হাত মুখে শেয়ালটার হঠাৎ উদয়, এটা বেটার চাল ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে ও চেয়েছিল, জন্তুটাকে দেখে সে ভয়ে লাঙ্কার জঙ্গলে লাফিয়ে পড়তেই পেছন থেকে ঘাড় মটকে দেবে।

রাখাল করুণভাবে বলে ওঠে, 'গজেনবাবু একটু আস্তে চলুন না ভাই। জলকাদায় যে ভালভাবে এগুতে পারছি না—'

ভাল বলেছ, আস্তে চলব। তুমি কি আমায় বোকা ঠাউরেছ ? সত্যি তুমি হাঁটতে পারছ কি না পারছ তার আমি কি জানি। আমি কি আর তোমার মত আঁধারে সব দেখতে পাই ?—মনে মনে কথা-

গুলো আওড়ালেও মুখে বলে গজেন, 'আস্তে চললে তো হবে না। কুসুমগ্রাম যে এখনো অনেকটা পথ—বৃষ্টি বেড়েই চলেছে।'

তাতো বটেই। রাখালের ভাবনাতেও বিদ্‌ঘুটে সব চিন্তা ফুটতে থাকে: তুমি খুব চালাক গজেন। আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারো শ্মশানের দিকে নিয়ে যেতে চাইছ তাই না? হেঁ-হেঁ, আমি কিন্তু সে বান্দা নই। শ্মশানের কাছে পৌঁছবার আগে আমি ঠিক সটকে পড়ব। আমি তোমার মতলবটা ধরতে পারিনি ভেবেছ? আমার মনের কথা তুমি জানলে কি করে? আমি কুসুমগ্রাম যাব একথা তো তোমাকে আগে বলিনি। তাছাড়া তোমার টাইটেল 'সোরেন।' মনে হচ্ছে তুমি আদিবাসী।

কুসুমগ্রাম ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। যতদূর জানি, ওগ্রামে কোন আদি-বাসী নেই। তাছাড়া, পিসেমশাইয়ের বাড়ির পেছনে, নিত্যানন্দ যা বলে, কোন বসত নেই, রয়েছে মস্ত বাঁশঝাড়। গুলগাপ্পা মারলেই হল!'—মনে মনে এইটুকু বলে ঢোঁক গেলে রাখাল। গজেনের কথার উত্তর করে না।

গজেন তখন ভাবছে: আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ হতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে অনেক খাটো নই রাখালচন্দ্র। তেঁতুল-তলার মোড়ে বললে—এই মাত্র বাস থেকে নামলুম। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল—তুমি ডাহা মিথ্যে কথা বলছ। আমি তো অনেক দূর থেকে বাঁধানো রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছিলুম। কই, বাসটাস তো চোখে পড়েনি।

অপরদিক থেকে গোঙানির মত ছুটে আসছে ঝোড়ো হাওয়া। এদিকে সেদিকে আঁধারের চর নেমেছে। বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ফোঁটা আলপিনের মত গায়ে বিঁধছে। পথ আঠালো। কেউ যেন পা ধরে টানতে চাইছে।

রাখাল বিড়বিড় করে বলে চলেছে একমনে: তুমি আসছ গাবতলি থেকে। বেড়ে নাম নিয়েছ কিন্তু। গাঁয়ের লোক না হলেও বইতে পড়েছি, গাবগাছেও তেনারা থাকেন। ভাইঝির কলেরা

হয়েছে ? তা যে তোমাকে খবরটা গাবতলিতে গিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গেই এলে না কেন ? এর আগে নাকি এখানে শাকচুন্নির পাল্লায় পড়েছিল। যদি তাই হয় তাহলে জেনেশুনে ঘোর সন্ধ্যায় তেঁতল-তলার পথ ধরে ফের কুসুমগ্রাম যাচ্ছিলে কোন্ বুদ্ধিতে ? সত্যি, তোমাদের মত সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে বলতে মানুষেরাও পারে না। ভেবেছ আমি হাঁদাগঙ্গারাম, কিছুই বুঝতে পারি না, তাই না ? কিন্তু বাপহে, বলে রাস্তার ধারের লাক্ষার ঝোপে পড়ে গেলে, অন্ধকারে সেটা অত তাড়াতাড়ি খুঁজেপেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া সব জিনিস ঠিকমত তুলে নিয়ে উঠে এলে কি করে। তুমি কি ম্যাজিক জানো ?

হঠাৎ কড়্-কড়্-কড়াৎ শব্দে মাঠের ভেতর একটা বিশাল বাজ পড়ল। সেই বাজপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চকিতে এক তীব্র নীল বিদ্যুতের ঝলকানি ছুটে গেল। সেই আলোয় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া গজেনকে দেখে রাখালের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

রাখাল স্পষ্ট দেখল, তার সম্মুখবর্তী কুঁজোমতন গজেন সোরেন নামধারী শয়তানটা মুহূর্তে কি বিরাট লম্বা, টানটান হয়ে উঠছে।

পেছন থেকে রাখালের ভয়ার্ত চিৎকার শুনেও গজেন দাঁড়ায় না। কেননা সে বিলক্ষণ জানে, প্রেতাত্মা পিছু নিলে কখনো ফিরে তাকাতে হয় না। অতএব সে এবার আরো জোরে, যতটা দম্ আছে নিংড়ে, বলতে গেলে একরকম ছুট লাগাল।

পেছন থেকে ফের রাখালের কাতর চিৎকার ভেসে আসছে, 'একি গজেনবাবু, রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের মাঠে নামলেন কেন ?'

কি ফ্যাঁস ফ্যাঁস অলুক্ষুণে গলারে বাবা ! মানুষের হতেই পারে না। গজেন তবু ব'লে ওঠে, 'মাঠ কোথায়, এদিকে একটা পথ আছে। তাড়াতাড়ি এপথ ধরে কুসুমগ্রামে পৌছুনো যাবে।'

দারুন ভয়েও রাখালের বুদ্ধিটা বিকল হয়নি। সে ফের নিজের মনে মনে বলতে লাগল : চমৎকার ফন্দী ! উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে

আমাকে তুমি ওই পথে নিয়ে যেতে চাও, এই তো! কিন্তু আমি ভাল করেই জানি, ওপথ দিয়ে গেলে শ্মশান পড়বে—

'কি রাখালবাবু, নেমে আস্থন।'—গজেন চেঁচিয়ে বললেও সে চাইছিল রাখাল যেন সত্যি নেমে না আসে এই পথে। ও এদিকে এলে আর রক্ষে নেই—

'না মশাই, ওদিকে যাব না, ওধারে জলকাদা—,' বলেই রাখাল সামনের দিকে ছুটতে শুরু করে দেয়। প্রাণপণে যেন অলিম্পিকের একশ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগী সে। তারপর, সত্যি, সেই ঝোড়ো বাতাস বর্শাফলকের মত বৃষ্টি আর মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ঝলকানির ভেতর যে ভয়াল ভয়ঙ্কর শুরু হয়ে যায় এক জানপ্রাণ রানরেস। রাখাল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ছুটছে, গজেনও উর্ধ্বশ্বাসে। সেকি দৌড় দুজনের। দুজনেরই ভয় এই বুঝি কেউ এসে ধরে ফেলল। তারপর—

রাত তখন প্রায় দশটা। কুসুমগ্রামের ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় লোক উপচে পড়ছে। অনেকক্ষণ হল জলঝড় থেমে গেছে। কিছুক্ষণ আগে গ্রামের দক্ষিণ সীমানার বাঁশঝাড়ের কাছে এক চাপা গোঙানীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছেলে ছোকরার দল লণ্ঠন আর লাঠি-সোটা হাতে সেখানে গিয়ে দেখে, একটা লোক কাদায় পড়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। লোকটার পরনে টেরিলিনের শার্ট আর কর্ডের প্যান্ট, কাদায় অবশ্য রঙ চেনা দায়। আর ডান হাতে ঘড়ি, পায়ে কাবলি স্যাণ্ডেল, সারা শরীর কাদায় মাখামাখি। দূরে একটা কিট্‌ব্যাগ পড়ে আছে। তাকে ধরাধরি করে ইস্কুল বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সীতানাথ চক্রবর্তী এসে তাকে সনাক্ত করে গেছেন। লোকটা আর কেউ নয়, শ্রীমান রাখাল সিকদার।

রাখাল একটু সুস্থ হয়ে উঠতে ছেলেরা যখন তাকে সীতানাথবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য তোড়জোড় করছে ঠিক তখন ইস্কুল বাড়ির ভেতর দিকের একটা ঘর থেকে দারোয়ান হরিমণ্ডলের বউ যমুনা পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে সামনের বারান্দার দিকে। কি ব্যাপার! সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। যমুনা হাউমাউ শব্দে জানায়

অনেকক্ষণ ধরেই নাকি ইস্কুল বাড়ির পেছনের ডোবাটায় কে বিশ্রি নাকি সুরে কেঁদে চলেছে।

শুনেই ছেলের দল হইহই শব্দে সেদিকে ছুটে যায়। তারপর এক সময় ডোবার হাবুডুবু জল থেকে যে লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে তোলে তার গায়ে ফতুয়া, গলায় গুচ্ছের তাবিজ-কবজ, হাতে একটা থলে। আর হাওয়াই চটিজোড়া ভাসছে ডোবার জলে।

ছেলেবেলার ভূত

না. কারুর মুখ থেকে শুনে লিখছি না। বানিয়েও না। বিশ্বাস করো, ছেলেবেলায় স্বচক্ষে আমি এক জলজ্যান্ত ভূত দেখেছিলাম। শুধু আমি একলা নই, আমাদের পাড়ার অনেকেই।

তখন আমার বয়স চার কি পাঁচ হবে। সে সময় আমাদের দিক-টাতে একটা বিদ্‌ঘুটে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছিল।

আমাদের পাড়া মানে এই কলকাতা শহরেরই দক্ষিণেরই একটা অংশ। এখন যেখানে বাড়ি-ঘরের জটিলতায় আকাশ দেখা যায় না—ঢাকুরিয়ার সেই পশ্চিম ভাগটা আমাদের ছেলেবেলায় ছিল পাড়াগাঁ ধরনের। বাঁশঝাড় ছোটবড় নানামাপের অজস্র পুকুর উত্তরে ছিল। দক্ষিণে বিশাল গড়খাই, মাঝে মাঝে ফলের বাগান কালকাসুন্দের ঝোপ, কি না ছিল। শীতকালে ভর দুপুরে প্রায়ই দেখতাম শেয়াল-মা তার ছানাপোনা নিয়ে গর্ত থেকে ফাঁকায় উঠে এসে রোদ পোয়াচ্ছে। আর ছাঁচতলায় হরবকত ছোটাছুটি করত বেজী আর গন্ধগোকুলের দল। সন্ধ্যে নামতে না নামতেই ঝোপেঝাড়ে ঘড়াঁসার চোখ ধক ধক করে জ্বলত।

সেই সময়, সবে জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে আষাঢ় পড়েছে, বৃষ্টিটৃষ্টিও হচ্ছে বেশ, শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই পিলে চমকানো ভূতের দৌরাত্ম্য।

হঠাৎ বলাকওয়া নেই মাঝরাত্তিরে শোনা গেল ঘোষবাড়ির টিনের চালে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে—কাঠের খড়ম পরে হাঁটলে যেমন হয়, তেমনি এক ঘচাং মচাং বিশ্রি আওয়াজ।

ঠিক তার দুদিন পরে শ্যাম কোটাল ভোর বেলা তার গোয়াল ঘরে দুধ দুইতে গিয়ে বিকট চিৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করল। কি ব্যাপার,—সবাই গোয়ালে ঢুকে দেখে, শ্যামকোটালের সবচেয়ে পুরুষ্টু দুধেল গাইয়ের বাঁট সাতসকালে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে আছে। আর ঠিক বাঁটের ওপরেই কয়েকটা বেশ বড় দাঁতের কামড়ের দাগ। এক-

মাত্র দুধরাজ নামে এক জাতীয় বিষধর সাপই নাকি গরুর বাঁট চুষে দুধ খায়। শ্যামকোটাল হাউ মাউ করে বলল, বাবুরা, এ কিছুতেই দুধরাজের কাজ নয়। দুধরাজের দাঁত এত বড় হতেই পারে না, তাহলে আর কোন্ প্রাণীর হতে পারে। শেয়াল কুকুর তো আর গরুর দুধ খেতে আসবে না। সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষবাড়ির রাত্তিরের ঘটনাটার কথা মনে পড়ে। কেউ আর উচ্চবাচ্য করে না।

আতঙ্কিতমুখে যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বিপিন মণ্ডলের ছেলে হারু খুবই ডাকাবুকো ধরনের। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রাতদিন আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেবারও বৃষ্টিতে আশেপাশের পুকুরটুকুর ভেসে গিয়ে বাড়তি জল আমাদের পাড়ার পুবের নিচু মাঠটায় জমেছে। হারুও যথারীতি তৈরি। রাত একটু মজতে লণ্ঠন হাতে কোঁচ আর খালুই নিয়ে হারু পুকুরভাসি মাছের খোঁজে সেই জলে থইথই মাঠে নেমেছে। হারুর চোখের দৃষ্টি যেমন তেজালো হাতের নিশানাও তেমনি অব্যর্থ। সে টকাটকএকদেড় পোয়া ওজনের মাছ গাঁথে আর খালুইতেভরতে থাকে। বেশির ভাগই পোনামাছ। শেষে খালুই ভরে উঠলে সে ডাঙায় এসে একটা শ্যাওড়া গাছের ডালে খালুইটা ঝুলিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে জম্পেশ করে টানতে থাকে। হঠাৎ জলের ভেতর কিছুটা দূরে একটা বড় ঘাই উঠতে হারু লোভ সামলতে পারে না। হাতের আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোঁচটা বাগিয়ে ফের জলে নেমে পড়ে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে দেখে, ও হরি, মাছ নয়—একটা গোসাপ। সে ব্যাটাও হারুর মতই মাছের খোঁজে জলে ঘোরাফেরা করছে। বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় হারু। তারপর ডাঙার দিকে তাকাতেই ভয়ে তার হাতে পায়ে খিল লেগে যায়। লণ্ঠনটা টুক করে পড়ে যায় জলে। দেখে, একটা মিশকালো হিলহিলে ছায়ামূর্তি শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে খালুইটা পেড়ে নিয়ে একটা মাছ মুখে পুরে কচকচ করে চিবচ্ছে। পরদিন সকালে হারুকে জল কাদা থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

সতীশ মিত্তিরের দিদি ছিলেন পাড়ার সার্বজনীন বুড়িপিসি।

বালবিধবা। ভাইয়ের সংসারেই মানুষ। পাড়ার সকলে বুড়িপিসিকে ভালোবাসত। বুড়িপিসি দিনমান ঘুরে ঘুরে এবাড়ি সেবাড়ির খবরা-খবর নিতেন। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন সত্যনারায়ণ পুজো আঁতুড়ঘর—সব কাজেই বুড়িপিসির ডাক পড়ত। বিধবা মানুষ। একাহারী। খাওয়া সারতে বিকেল হয়ে আসত। সতীশ মিত্তিরের বাড়ির পেছনদিকে ছিল একটা এঁদোপুকুর। বুড়িপিসি অনেকগুলো হাঁস পুষতেন। হাঁসগুলো দিনভর এঁদো পুকুরটায় চরে বেড়াত, গেঁড়ি গুগলি তুলত পাঁক থেকে। সেদিন খাওয়ার শেষে অবশিষ্ট কিছু এঁটো ভাত-তরকারি সমেত পাথরের থালাটা নিয়ে এঁদোপুকুরের তাল পৈঠায় এসে দাঁড়িয়েছেন বুড়িপিসি। একেই বেলা আর বেশী নেই। তার-ওপর আকাশ মেঘে কালো হয়ে ওঠায় উলুমঝুলুম অন্ধকার নেমেছে। বুড়িপিসি প্রতিদিনের মত মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ তুলে ডাকছেন—'চই-চই চই-চই—' ও মা, হাঁসগুলো দূরের পানাদাম থেকে ফিরে আসবার আগেই পুকুরপাড়ের বেলগাছ কি জামগাছটা থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে সেই অশরীরী। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে পাথরের থালাটা টেনে নিতে 'উফ্, মাগো, মেরে ফেললে গো' বলে বুড়িপিসি টাল খেয়ে পাড়ের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। পরের দিন চেঁচা-মেচিতে মিত্তির বাড়ি সরগরম। বুড়িপিসির কোলে কাঁখে বোঁচকা-পুটলি। তিনি কারুর কথা শুনতে রাজি নন। সমানে গলা ফাটাচ্ছেন, 'সতীশ, এখনই চল্। আমাকে হাওড়া ইষ্টিশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিবি। আমি আর এক বেলাও এই ভূতের রাজ্যে থাকব না। কাশী চলে যাব—।' পাড়ার বয়স্করা সে যাত্রা অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বুড়িপিসিকে শান্ত করে।

তার কয়েকদিন পরের কথা। আমাদের পাড়ার পশ্চিমে, এখন যে জায়গাটা সেলিমপুর নামে পরিচিত, সেখানে তখন ছিল একটা পরি-ত্যক্ত কবরখানা। কবরখানার গা ঘেঁষে এক মস্ত তাল বাগান। রাত ফর্সা হতে না হতেই পাড়ার ছেলেরা সেখানে তাল কুড়োতে যেত। সেদিন পাড়ার জনাতিনেক ছেলে তাল বাগানে ঢুকেছে। গোটা পাঁ

ছয় পাকা তাল থলিতেও ভরেছে। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা বড় তাল গাছের নিচে একটা ছাই রঙা নরকঙ্কাল দাঁড়িয়ে। তার ডান হাতে একটা তাল। ছেলের দল ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই ঘটে যায় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। হাতের তালটা ফেলে দিয়ে প্রাণীটা ক্যাঙারুর মত বিরাট লাফ মেরে মেরে কাঁটা ঝোপ ডিঙিয়ে চোখের পলকে গড়খাইয়ের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই থেকে ছেলেরা আর ওমুখো হয়নি।

কিম্ভুটে ভূতটার অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই থাকে। আজ এ ফলের বাগানে আম সব শেষ, কাল ও বাগানের জামরুল হাওয়া। আজ চাটুজ্জে বাড়ির গিন্নী রান্নাঘরে ডালে ফোঁড়ন দিতে গিয়ে, হঠাৎ জানালায় চোখ পড়তেই বিরাট দুটো ধকধকে চোখ দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন, কাল দত্তবাড়ির ছেলে বাইরের ঘরে পড়তে বসে লণ্ঠনের আলোয় দেয়ালে বিদ্ঘুটে এক ছায়া দেখে আঁৎকে ওঠে। ভিরমি খায়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হতে না হতেই সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যায়। যারা অফিস কাছারিতে যান তারাও যত তাড়াতাড়ি পারেন বাস কিংবা ট্রেন থেকে নেমে দুর্গানাম জপতে জপতে বাড়ি ফেরেন। সে এক অসহনীয় পরিস্থিতি!

সহ্য করা ছাড়া উপায়ই বা কি। ভূতটা মেছো না গেছো; শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদৈত্যি না মাম্‌দো তা বোঝা গেলেও না হয় ওঝাটোঝা ডেকে একটা বিহিত করা যেত। শেষমেশ রেললাইনের পূর্ব পাড়ের নব যুবক ব্যায়াম সমিতির ছেলের দল ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তারা আমাদের পাড়ার বয়স্কদের অভয় দিয়ে বলল, 'আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমরা ডিফেন্স পার্টি তৈরি করছি। সারারাত জেগে আপনাদের পাড়া টহল দেব। দেখি, ভূত বেটা কি করে।'—চোর তাড়াতে ডিফেন্স পার্টি তৈরি করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ভূত কি এভাবে তাড়ানো যায়। প্রস্তাবটা মনঃপুত না হলেও পাড়ার লোকজন ওদের কথায় শেষ পর্যন্ত দায়ে পড়ে তেতো ওষুধ গেলার মত সায় জানায়।

তারপর বেশ কয়েক দিন ধরে চলল নবযুবক ব্যায়াম সমিতির ছেলে-ছোকরাদের দাপাদাপি। মশাল আর লণ্ঠন হাতে এরা সারা-রাত পাড়ার ভেতর দৌড়াদৌড়ি করে। হুইসেল বাজায়। চেঁচিয়ে একজন আরেকজনকে ডাকে। তাতে অনেকেরই ঘুমের দফা রফা হলেও একটা বিষয়ে সকলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। তাহলেত, ভূতের ভয় থেকে কিছু দিনের জন্য পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

শেষমেশ, বললে বিশ্বাস করবে না, ভূতটা একদিন ধরাও পড়ে যায় অবশ্য ডিফেন্স পার্টির হাতে নয়।

সেদিন ভোরের দিকে আমাদের বাড়ির উত্তরে মজুমদার বাড়ির লাগোয়া বাঁশঝাড় থেকে হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসে। তখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। মজুমদার বাড়ির বড় ছেলে কলেজে পড়ে, সেই আওয়াজ শুনে বাঁশ ঝাড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে ভেতরে একজন কে তেঠ্যাঙা হয়ে বসে কোঁকাচ্ছে। চার-দিক থেকে লোকজন সেখানে ছুটে যায়। তারপর সেই ভূতটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাদের বাড়ির সামনের উঠোনে নিয়ে আসা হয়।

দেখে তো ভয়ে আমাদের গায়ে কাঁটা। লম্বা ঢ্যাঙা, রোগা হাড্ডি-সার চেহারা। পাঁজরার প্রত্যেকটা হাড় আলাদা আলাদা করে গোনা যায়। মাথা থেকে বটের ঝুরির মত চুলের জট নেমেছে। মুখভরে সন্ন্যাসীদের মত দাড়িগোঁফ। সারাগায়ে কেউ যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। পরনে হাড়ো পাতলা চামড়া। শুধু কোমরের দিকটাতে একফালি নোংরা ন্যাকড়া। সবচেয়ে মারাত্মক চোখ দুটো। ধকধক করে জ্বলচে। দেখলে মনে হয়, বিশ্বসংসার সব যেন চিবিয়ে খাবে।

সবাই মিলে নানা রকম প্রশ্ন করে। ভূত জবাবে কিছুই বলে না। শুধু পেটে একটা হাত রেখে মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ তোলে। পাড়ার সব-চেয়ে গণ্যমান্য জ্ঞানবান বিজ্ঞের মত বলেন, 'ব্যাটার হাবভাব লক্ষ্য করছ তোমরা। ভূত নয়, তবে নির্ঘ্যাৎ ভূতে ধরেছে লোকটাকে।'—সেকথা শুনে প্রতিবেশী মাধব দত্ত চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে

এখন উপায় ?'—'উপায় আর কি'। গম্ভীর মুখে জবাব দেন জ্ঞানবাবু, 'ব্যাটার শরীর থেকে ভূত তাড়াতে হলে ওঝা ডাকো শিগ্‌গির।'—সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার দুই ছোকরা তেলিপাড়ার দিকে ছোটে। সেখানে ব্রজেন ভূঁইমালি থাকে। ওঝা হিসেবে তার তখন যথেষ্ট নাম ডাক।

ভিড় একটু পাতলা হয়ে আসতে বাবা মাকে ডেকে পাঠান। মা তখন সবে রান্না ঘরের দিকে গেছে। বাবা এতক্ষণ চুপচাপ লোকটাকে দেখছিল। মা ফিরে এলে বাবা বলেন, 'রঘুকে দিয়ে এক ধামা মুড়ি, কিছুটা গুড় আর একবাটি গরম দুধ পাঠিয়ে দাও তো।'

বাবার কথার ইঙ্গিত মা ধরতে পারে না। কিন্তু বাবার মুখের ওপর কথা বলার মত সাহসও নেই মার। মা আবার রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়।

খানিক বাদে চাকর রঘু মুড়ি গুড় দুধ নিয়ে ফিরে এলে বাবা উঠোনে নেমে খাবারগুলো সেই চুল দাড়ি আলা কঙ্কালটার সামনে রাখে।

তারপর সে এক কাণ্ড। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। সব খেয়ে নিয়ে চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে বাবার পায়ের কাছে পড়ে খোনা খোনা গলায় বলতে থাকে কঙ্কালটা, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন বাবুমশাই। আমি বাদার দেশের লোক। বন্যায় ঘরবাড়ি সব ভেসে যাওয়ায় এখানে এসেছি। ছেলেছোকরাদের জ্বালায় পাঁচ ছ'দিন হয়ে গেল পেটে একফোটা দানাও পড়েনি—'

ক্রমশ ওর কালসিটে পড়া মুখে হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

আমি অবাক হয়ে গিয়ে বলি, 'বাবা, কই, এতো ভূত নয়—এযে দেখছি মানুষ!' বাবা হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মাথা নাড়েন, 'ঠিক বলেছিস। এতকাল ভূতই ছিল। পেটে দানা পড়ায় আবার মানুষ হয়ে উঠেছে।'

আমার বন্ধু বিল্ব

বিল্ব যে একদিন আমারই গল্পের নায়ক হয়ে উঠবে একথা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কয়েকজন তো বেশ নামটামও করেছে। কেউ বিলেতফেরত ডাক্তার, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক, কেউ বা আবার নামী ইঞ্জিনীয়ার। ব্যতিক্রম একমাত্র বিল্ব। ছেলেবেলা থেকে ওকে একই রকম দেখছি। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। কোন পরিবর্তন হয়নি। না স্বভাবের, না চালচুলোর। মোদ্দা কথা, ওর জীবনে এমন কোন নাটকীয় উত্থান-পতন ঘটেনি যা নিয়ে একটা জুতসই গল্প বানানো যায়। অথচ, বিধাতাপুরুষের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সেই বিল্বই আজ আমাকে খাতা-কলম নিয়ে বসতে বাধ্য করেছে।

বিল্বর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। সেই আটচল্লিশ সাল থেকে। আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। সেই সময় বিল্ব ওপার বাংলা থেকে এসে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়। মাঝারি লম্বা। চেহারার বাঁধুনিটা মজবুত। গায়ের রঙ মিশকালো। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে কলার ছাড়া বুক খোলা ছিটের জামা, দেখতে অনেকটা ফতুয়ার মত। আর তাপ্পি মারা খাকির হাফপ্যান্ট। খালি পা, গোড়ালি অব্দি শুকনো কাদার প্রলেপ। দেখে মনে হয়, এই বুঝি চাষবাসের কাজ সেরে মাঠ থেকে উঠে এল। সারামুখে শিউলির ছোপ। গজদন্ত। বোকা বোকা চাউনি। জিভ পুরু বলে কথায় ঈষৎ জড়তা। সেই সঙ্গে আবার পূর্ববঙ্গের টান।

এ হেন গেঁয়ো ভূতকে পেয়ে আমরা তো আহ্লাদে আটখানা। আমাদের উল্লাস দেখে কে! প্রথম দিন থেকে ক্লাসশুদ্ধ সবাই ওর পেছনে লাগলাম। একটু অন্যমনস্ক হলো কি অমনি আমরা ওর খাতা-

বই হাতিয়ে নিতাম। পেছনের বেঞ্চে বসে টিপ করে ইটের টুকরো ওর মাথায় ছুঁড়ে মারতাম। জামায় কালি ছিটোতাম। স্কুল ছুটির পর ছলছুতা করে ঝগড়া বাধাতাম। আর সেই সুযোগে চড়চাপড় কযিয়ে কিংবা গাঁট্টা মেরে হাতের সুখ করে নিতাম।

আমাদের দেখাদেখি মাস্টারমশাইরাও প্রথম দিকে বিল্বর প্রতি নির্দয় ছিলেন। পড়াশুনোয় মনোযোগ থাকলেও মগজে তেমন বুদ্ধি ছিল না ওর। তার ওপর আমাদের লাগানি ভাঙানি। ফলে প্রায় প্রত্যেক পিরিয়ডেই বিল্বকে তুচ্ছ কারণে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হত। কখনো জুটত বেত বা ডাস্টারের বাড়ি। কখনো বা নীলডাউন হয়ে থাকত গোটা পিরিয়ড। আবার কখনো দু কান ধরে ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত ওকে।

বাইরে থেকে দেখে হাঁদা গঙ্গারাম বলে মনে হলে কি হবে, বিল্বর ভেতরটা কিন্তু ছিল এক আশ্চর্য ধাতু দিয়ে তৈরি। যে কোন অত্যাচার আর অবজ্ঞা নীরবে সহ্য করার মত এক দুর্লভ গুণ ছিল ওর। ফলে যা হয়। প্রতিপক্ষ যদি সব নিপীড়ন হাসিমুখে হজম করে নেয় তাহলে লড়াই বেশিদূর এগোয় না। যে কারণে মাস দেড় দুয়ের মধ্যেই আমাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর গোটা ব্যাপারটাই উল্টোমুখো হয়ে গেল। যেন এক জাদুমন্ত্রবলে বিল্ব আমাদের রাতারাতি জয় করে ফেলল। আসলে ওর স্বভাবে এমন একটা আন্তরিকতার সজল স্পর্শ ছিল যে ওকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য! পাত্তা না দিলেও আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। বলতে গেলে একরকম জোর-জবরদস্তি করেই বিল্ব আমাদের ভালবাসা আদায় করে নিয়েছিল। এর ওর খাতা কেড়ে রুল টেনে দেওয়া, প্রত্যেকের ক্ষয়ে যাওয়া পেন্সিলের শিস সুন্দর করে কেটে দেওয়া থেকে ছেঁড়া বই কিংবা ফেঁসে যাওয়া ছাতা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চমৎকার করে বাঁধাই-সেলাই করে ফেরত দেওয়া—এমনি টুকিটাকি উপকার করত আমাদের। তাছাড়া কথায় অল্প জড়তা থাকলেও দারুণ সব গল্প জানত বিল্ব। সেগুলো কোন বইয়ে পড়া

মামুলি গল্প নয়, একেবারে টাটকা শাকসব্‌জির মতই গ্রাম থেকে আমদানি করা। তার কোনটা ভূতের, কোনটা মজার, কোনটা আবার বিচিত্র অভিজ্ঞতার। টিফিনের সময় আমরা হই-হুল্লোড় মুলতুবি রেখে ওর চারপাশে গোল হয়ে বসে সেইসব গল্প গিলতাম গ্রোগাসে। সত্যি বলতে কি, শেষের দিকটায় এমন হয়ে গিয়েছিল যে বিল্ব কোন কারণে স্কুলে না এলে সারাটা দিন আমাদের কেমন যেন আলুনি আলুনি লাগত।

পীড়নের মত ভালবাসা ব্যাপারটাও সম্ভবত ছোঁয়াচে। মাস্টার-মশাইরাও ধীরে ধীরে বিল্বকে ভাল চোখে দেখতে শুরু করলেন। সর-স্বতী পুজো আসছে। হেড স্যার দরোয়ানের হাতে চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বিল্বকে ডেকে পাঠালেন। পুজোর মূল দায়িত্ব ওকে দেওয়া হলো। দক্ষিণ কলকাতা স্কুল লীগের ফুটবল খেলা। গেম টীচার অসুস্থ। কে ছেলেদের নিয়ে খেলতে যাবে লেক মাঠে? তলব করা হলো বিল্বকে। দলের দেখাশোনার ভার পড়ল ওর ওপর। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব। ভলানটিয়ার ইনচার্জ করা হলো বিল্বকে। পড়া-শুনোয় তেমন ভাল না হলেও জনপ্রিয়তায় এক সময় ও স্কুলের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

বিল্বর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার একটা বড় কারণ, ওরা থাকত আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। আমাদের বাড়ির পেছনে চৌধুরীদের বাগান। তারপর মস্ত একটা পুকুর ছাড়ালে রেলগুমটির লাগোয়া এক মাঠকোঠায় থাকত ওরা।

মনে পড়ে, ছুটির দিনে প্রায়ই ঢুঁ মারতাম সে মাঠকোঠায়। পর-পর দুখানা ঘর। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিল এক ছুতোর মিস্ত্রি। আরেকটায় থাকত বিল্বরা। সেটাকে ঘর না বলে অন্ধকূপ বলাই ভাল। ছোট একটা ফোকর ছাড়া জানলা-টানলা ছিল না কিছু। দিনের বেলাতেও ভেতরটা তাই কেমন ভূতুড়ে লাগত। তিনটি প্রাণী নিয়ে বিল্বদের সংসার। ওর মা, দাদা আর ও নিজে। বাবা মারা গিয়ে-ছিলেন আগেই। ওর দাদা ছিল আমাদের থেকে বছর দুয়েকের বড়।

ওপার থেকে এসে দাদা আর স্কুলে ভর্তি হয়নি। ট্রেনে মশলামুড়ি বিক্রি করত। আর বিল্বর মা, যখনই গেছি, দেখেছি—দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হয় কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটছেন, নয় তো আবার কাগজ নিয়ে বসে ঠোঙা বানাচ্ছেন। ভারি ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। যখনই গেছি একগাল হেসে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন। ভেতর থেকে একটা ছোট তালপাতার চাটাই নিয়ে এসে পেতে দিতেন সামনের দাওয়ায়। তারপর প্রতিদিনই, একটা চটা ওঠা কলাইয়ের বাটিতে করে তিলের নাড়ু, ছোলাসেদ্ধ কিংবা চালভাজা—যা হোক একটা কিছু আমার হাতে দিতেন।

তখনো ঢাকুরিয়া পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠেনি। বাড়ি-ঘরের মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় ফলের বাগান মাঠ পুকুর এসব ছিল বেশ কিছু। বিল্বই আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছিল। ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিজে আমাকে নিয়ে যেত সেলিমপুরে। নেতাজী সংঘের মাঠের পেছনের তালবাগানে। থলি বোঝাই করে তাল নিয়ে ফিরে আসতাম আমরা। জামরুল গাছে উঠে লাল পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ডিম সংগ্রহ করতাম। তারপর সেই ডিম বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরতাম পুকুরে। তখন ঢাকুরিয়া আর যাদবপুরের সীমানা বরাবর একটা বড় গড়খাই ছিল। গড়খাইয়ের ওধারে ধানক্ষেত। পুজোর পর হেমন্তের শুরুতে ধান পাকতে শুরু করলে সেই ক্ষেতে উড়ে আসত ঝাঁকে ঝাঁকে বন-টিয়া। বিল্ব কঞ্চিতে টোন সুতো দিয়ে এক ধরনের ছোট জাল তৈরী করত। তারপর আমরা দুজনে গড়খাই ছাড়িয়ে চলে যেতাম ওধারে। ধানক্ষেতে জাল পেতে চলে আসতাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদে গিয়ে দেখতাম—জালে একটা দুটো, কখনো বা তিনটে পর্যন্ত পাখি ধরা পড়েছে। বিল্ব একটা করে পাখি জাল থেকে বের করত। তারপর সেটাকে আলতো করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ আদর করে এক সময় উড়িয়ে দিত শূন্যে। পাখিটা ডানা মেলে কিছুটা আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে প্রথমটায় নিজেকে সামলে নিত। তারপর যতক্ষণ না ধানক্ষেতের দিগন্তে হারিয়ে যায় ততক্ষণ বিল্বর সে কী উল্লাস!

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ তুলে ক্রমাগত হাততালি দিতে থাকত। এমনি করে পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে ও যে কী আনন্দ পেত জানি না। একবার শীতকালে আমাদের বাড়ির ছাঁচতলায় একটা সুন্দর ছোটখাট ফুলের বাগান তৈরি করে দিয়েছিল বিল্ব। কোত্থেকে যোগাড় করে এনেছিল নানা জাতের মরসুমী ফুলের গাছ, পাতাবাহার, বনঝাউয়ের ডাল আর রঙকচুর চারা। বাগানটা দেখে আমার বাবার মত রাশভারি মানুষটি পর্যন্ত থ। একবারের কথা খুব মনে পড়ে। তখন আমরা ক্লাস টেনে পড়ি। নষ্টচন্দ্রার রাত। আমরা দুজন পাঁচিল ডিঙিয়ে চৌধুরীদের বাগানে ঢুকেছি। বিল্ব একটা লিচু গাছে উঠে পড়েছে। আমি নীচে দাঁড়িয়ে। ডালপালা ভাঙার শব্দ শুনে এক সময় হঠাৎ বাগানের মালী লাঠি হাতে ছুটে এল। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ-দৌড়। বাবা জানতে পারলে আর আস্ত রাখবেন না। বিল্ব সে রাতে ধরা পড়ে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই আমার নাম বলেনি।

ক্লাস এইট থেকে নাইনে সেকেণ্ড চান্সে এবং নাইন থেকে থার্ড চান্সে টেনে উঠলেও বিল্ব টেস্ট পরীক্ষায় অ্যালাউ হতে পারেনি। সেই সময় ওরা মাঠকোঠা ছেড়ে রেললাইনের ওধারে বেশ কিছুটা দক্ষিণে এক উদ্বাস্তু কলোনীতে চলে যায়। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। বলতে সেই সময় থেকেই বিল্বর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে চলে যাই পাটনায় মামাবাড়িতে। সেখানে কলেজের পড়া শেষ করে বদলীর চাকরি নিয়ে দশ-বারো বছর হিল্লী-দিল্লী ঘুরে যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন ঢাকুরিয়া রীতিমত শহর।

হঠাৎ একদিন রেল স্টেশনের কাছে বিল্বর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে চেপে ব্যাঙ্ক প্লটের দিক থেকে ও আসছিল। পেছনের কেরিয়ারে দুটো টিনের বাক্স দড়ি দিয়ে বাঁধা। চমকে উঠলাম। দেখি, একই রকম রয়ে গেছে বিল্ব। পরনে ফতুয়ার মত ছিটের জামা, খাকির হাফপ্যান্ট। খালি পা, গোড়ালি অব্দি শুকনো কাদা। শুধু রোদে ঝলসে যাওয়া মুখটাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর শরীরের তুলনায় পেটটা একটু ফোলা। এইটুকু যা পরিবর্তন।

বিল্ব সাইকেল থেকে নেমে পড়ে ছেলেবেলার মতই সারা মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়িয়ে বলল, 'নীলু, তুই ! কদ্দিন বাদে দেখা। বল, কেমন আছিস ?'

'ভালই। এই তো মাসখানেক হলো ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেছি। তা, তুই এখন কী করছিস ?'

'কী আর করব। তোদের মত লেখাপড়া তো আর হলো না!' —নির্বিকার গলায় উত্তর করে বিল্ব, 'দোকানে দোকানে টফি আর লজেন্স সাপ্লাই দিই।'

ওর কথা শুনে মুহূর্তের জন্য থতিয়ে গেলাম। তারপর প্রসঙ্গটাকে পাশ কাটাবার জন্য শুধোলাম, 'তোর বাড়ির সবাই ভাল আছে তো?'

'তুই যাদের দেখেছিস তারা কেউ বেঁচে নেই।'—আবার ভাব-লেশহীন গলায় উত্তর করল বিল্ব, 'দাদা মারা যায় চুয়ান্ন সালে। চলন্ত ট্রেনের কামরা বদল করতে গিয়ে পা হড়কে নীচে পড়ে যায়। আর মা, গত বছর—'

এর পর আর কী প্রশ্ন করা যায় ভেবে উঠতে পারলাম না। তাই তাড়াতাড়ি হাতঘড়িতে চোখ নামিয়ে শশব্যস্ত হয়ে বললাম, 'এখন চলি রে। অফিসের তাড়া। হাতে সময় নিয়ে ছুটির দিনে একবার বাড়িতে আয়। চুটিয়ে গল্প করা যাবে।'

'উঁহু', মাথা ঝাঁকালো বিল্ব, 'তা হবে না। আগে তোকে আমার বাড়িতে আসতে হবে।'

'ঠিক আছে'—এইটুকু বলে আমি ট্রেন ধরবার জন্য ছুট লাগালাম।

তারপর যা হয়। প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি অফিসে থাকি। তারপর বাড়ি ফিরে সংসারে হাজারো ঝামেলা। কথা দিয়েও বিল্বর বাড়িতে যেতে পারি না।

শেষে একদিন আবার রাস্তায় বিল্বর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি ঝিল রোড ধরে নিউ ল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিলাম এক আত্মীয়ার বাড়ি। ছুটির দিন। বিকেলবেলা। বিল্ব ফিরছিল পালের বাজার থেকে। হাতে একটা থলি। এগিয়ে এসে শক্ত মুঠোয় আমার

একটা হাত ধরে বলল, 'এদ্দিনে পাকড়াও করেছি তোকে। চল আমার বাড়িতে—'

আত্মীয়ের বাড়িতে একটা জরুরী খবর দেওয়ার ছিল। তবু নীরব হেসে সম্মতি জানালাম। কী আর করি। বিল্বকে উপেক্ষা করার সাধ্য নেই আমার।

কাছেই শহীদনগর কলোনী। চার নম্বর ব্লকে বিল্বর বাড়ি। চারপাশের বড় বড় দালানের মাঝখানে ওর বাড়িটা খুবই বেমানান। টালিচাল, দরমার বেড়া, মেটে ভিত। বাড়ি না বলে একটা বড় ঝুপড়ি বলাই ভাল।

ভেতরে ঢুকতে সামনে একটা ছোট ঘর। ছোট ঘর থেকে ভেতরের বড় ঘরে ঢুকতে কপাটবিহীন দরজায় ঝুলছে রোঁয়া ওঠা একখানা বড় চট। আমার সাড়া পেয়ে কোত্থেকে বিল্বর ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। ওর পর পর দুই মেয়ে। তারপর এক ছেলে। ছেলের বয়স বছর দশেক হবে। সকলের চেহারা রোগা কাঠি কাঠি।

একটু বাদেই ভেতরের ঘর থেকে হাতল ভাঙা কাপে করে চা আর দুখানা নোনতা বিস্কুট নিয়ে বিল্বর বউ সামনের ঘরে ঢুকল। চিবুক অব্দি ঘোমটায় ঢাকা। পরনে রঙচটা ময়লা শাড়ি। বেঁটেখাটো, রোগাটে। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চায়ের কাপটা তক্তপোষে রেখে ভেতরের ঘরে ছুট লাগাল।

আমি শুধোলাম, 'তারপর, তোর ব্যবসা কেমন চলছে বিল্ব?'

'মন্দ নয়,' বিল্ব হাসল, 'দিনে আট দশ টাকা আয় হয়। তাতে সংসার তো মোটামুটি চলে যাচ্ছে। আবার কি—'

আট-দশ টাকায় এতবড় সংসার চালানো! ভাবতে বিষম খেলাম। তারপর চায়ের কাপটা নামিয়ে দুচারটে হাল্কা কথা বলে উঠে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের হিপ পকেটে হাত ঢোকালাম। মানিব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট বের করলাম। তারপর যেই টাকা কটা ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিতে গেছি, অমনি বিল্ব লাফিয়ে পড়ল আমাদের মাঝখানে। বলল, 'কী করছিস নীলু?'

'কী আবার। এই প্রথম তোর ছেলেমেয়েদের দেখছি। তাই মিষ্টি খাবার জন্য—'

'না'—বিল্বর কণ্ঠস্বর ধারালো হয়ে উঠল, কাঁচা পয়সা হাতে পেলে বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যায় একথা তুই জানিস না! তুই আবার যেদিন আসবি, সঙ্গে মিষ্টি নিয়ে আসিস, তাহলেই তো হলো।'

সত্যি, কত বছরের পরিচয়! তবু তখনো বিল্বর স্বভাবের অনেকটাই আমি জানতে পারিনি।

এর ঠিক মাস দুয়েক বাদে বিল্ব একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। দেখে চমকে উঠলাম। শরীরের কী হাল হয়েছে। চেনাই যায় না। উষ্কখুষ্ক চুল। গর্তে ঢুকে যাওয়া দু চোখ পাকা করমচার মত লাল। একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি। পেট আর পা দুটো শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশ ফোলা।

ভেতরে ঢুকে কোন ভনিতা না করে সরাসরি বিল্ব বলল, 'গোটা পঞ্চাশেক টাকা হবে তোর কাছে? মাস দুয়েকের আগে কিন্তু ফেরৎ দিতে পারব না।'

'নিশ্চয়ই হবে।'—বন্ধুকৃত্য করার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে। ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, আগে বোস তো। এ কী চেহারা হয়েছে তোর।'

বিল্ব বিশদ জানাল। মাস দেড়েক আগে হঠাৎ ওর পেটে জল জমতে থাকে। তারপর বাড়াবাড়ি হতে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সবে বাড়ি ফিরেছে। এদিকে সুযোগ বুঝে দোকানদারেরা বকেয়া পয়সা দিতে গড়িমসি করছে। তাই মহাজনও নতুন করে মাল দিতে চাইছে না। তাছাড়া কঠিন ব্যাধি। রোদে রাস্তায় ঘোরা একদম বারণ। তাই ও ঠিক করেছে, বাড়ির সামনে রাস্তার ধারের ফাঁকা জায়গাটায় একটা চা-তেলেভাজার দোকান দেবে। কিন্তু মূলধন বলতে হাতে কিছুই নেই।

সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা ওকে দিয়ে দিলাম।

ঠিক তার দুমাস বাদে, আমি তখনো অফিস থেকে ফিরিনি, বিল্ব টাকা কটা বাড়িতে এসে বাবার হাতে দিয়ে গিয়েছিল।

আবার বেশ কিছুদিন চুপচাপ। বিল্বর আর কোন পাত্তা নেই। শেষে গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এক রবিবার সকালে বিল্ব এল। আমি তখন বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। ওর চেহারা আরো ভেঙে গেছে। রীতিমত ধুঁকছিল। আমি হাঁক পেড়ে বাড়ির চাকরকে দু কাপ কপি করতে বলে শুধোলাম, 'তারপর বল, দোকান কেমন চলছে?'

'কলোনীর ভেতর দোকান। বেশির ভাগ ধারের খদ্দের।'—থেমে থেমে অর্ধমনস্কের মত বলতে লাগল বিল্ব, 'চালিয়ে যাচ্ছি কোনরকমে—'

ওর কথায় আগেকার স্বাভাবিক জোর ছিল না। ছেলেবেলার বন্ধু। ওর চোখের ভাষাটাও বুঝতে তাই অসুবিধে হলো না। প্রশ্ন করলাম, 'কিছু বলবি বিল্ব?'

'না, মানে—'

'বলেই ফ্যাল্ না। আমাকে লজ্জা!'

'মেয়েটা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে—', আমতা আমতা করে বিল্ব, 'জানুয়ারির ছ তারিখের মধ্যে ফী জমা দিতে হবে। এদিকে টাকাটা কিছুতেই যোগাড় করে উঠতে পারছি না—'

আমি উত্তরে কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালাম। ভেতরের ঘরে ঢুকে স্টীলের আলমারি খুলে একশ টাকার একখানা নোট বের করলাম। তারপর বাইরের ঘরে এসে টাকটা বিল্বর হাতে গুঁজে দিয়ে জোরের সঙ্গে বললাম, 'তোর মেয়ের পরীক্ষা। আগেই বলে রাখছি, এ টাকা আমি ফেরত নেব না।'

শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য থম্ মেরে গেল বিল্ব। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাটা নিয়ে মাথা নিচু করে নিস্তেজ গলায় বলল, 'ঠিক আছে।'

'আর একটা কথা।'—আবার বললাম।

'কী?'—মুখ তুলল বিল্ব।

'মেয়ের ফল বেরুলে খবরটা দিস কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই।'—বিল্বর ভাঙাচোরা মুখে ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর টানা পাঁচ ছ মাস বিল্বর দেখা নেই। অবশ্য এর মধ্যে আমিও ব্যস্ত ছিলাম। অফিসের কাজে বার কয়েক কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। বহু দিন বাদে, এই তো গত সপ্তাহের গোড়ার দিকে, জুন মাসের পঁচিশ কি ছাব্বিশ তারিখ হবে, রাত করে বাড়ি ফিরতে ভাইপো অন্তু জানাল, কে একজন নাকি সন্ধ্যার পর বার দুই আমার খোঁজে এসেছিল। চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হলো বিল্ব। নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজনে এসেছিল। ভাবলাম, ছুটির দিন সময় করে একবার ঢুঁ মারব ওর বাড়িতে।

কিন্তু তার আর দরকার হলো না। জুন শেষ হয়ে জুলাই মাস পড়তে না পড়তে পর পর তিন দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল বিল্বর সঙ্গে। প্রতিবারই সন্ধ্যার পর। কিন্তু কোন কথা হয়নি। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। প্রথম দেখা হল সেলিমপুর রোডের মুখে। বিল্ব বাস স্টপের ধারে একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের ছেলেবেলায় ওই দিকটায় ছিলতালবাগান। আমি রাস্তার উল্টোদিকে। যোধপুর পার্কের এক চীনে লণ্ড্রী থেকে কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে ফুটপাতে নামছি। হঠাৎ ওকে রাস্তার ওধারে দেখতে পেয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু একটা ডবল-ডেকার এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝখানে। রাস্তা পার হতে আধ মিনিটের মত সময় লাগল। ওধারে পৌঁছে দেখি বিল্ব নেই। সেলিমপুর রোডের ভেতরে ঢুকলাম। ফের বড় রাস্তায় ফিরে এলাম। তাকালাম এদিক সেদিক। আশ্চর্য, জলজ্যান্ত মানুষটা তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। শেষে খেয়াল হলো, বিল্ব হয়ত বাস ধরে যাদবপুরের দিকে কোথাও গেছে। আমাকে দেখতে পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই দাঁড়াত।

পরের দিন দেখা আমাদের পুরনো স্কুলবাড়ির সামনে। অফিস-ফেরতা আমি ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন রোড ধরে বাড়ির দিকে আসছি। বিল্ব স্কুল গেটের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমি দূর থেকে হাত নেড়ে ওকে ইশারায় ডাকলাম। তারপর পাশের দোকান থেকে পাঁউরুটি কিনে

ঘুরে দাঁড়াতে দেখি বিল্ব নেই। ভাবলাম, কোন কারণে হয়ত ভেতরে ঢুকেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মিনিট দশ বারো কেটে গেল। শেষে এগিয়ে যেতে দেখি, স্কুল গেটে তালা ঝুলছে। ভেতরটা অন্ধকার, কোন আলো-টালো জ্বলছে না। এবারেও মনে হলো, বিল্ব হয়ত আমাকে দেখতে পায় নি।

তৃতীয়বার দেখা আমাদের বাড়ির পেছনের রাস্তায়। এক সময় ওদিকটাতেই ছিল চৌধুরীদের মস্ত ফলের বাগান। এখন ওখানে হাল ফ্যাশানের বাড়ির ভিড়। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তুলসীবাবুর বাড়িতে যাচ্ছি। ভদ্রলোক খুব আড্ডাবাজ। মাঝে মধ্যে ওর বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করি। ওদের রাস্তায় ঢুকতে দেখি, একেবারে কোণায় ডাক্তার দত্তের বাড়ির সামনের চাঁপাফুল গাছটার নীচে বিল্ব দাঁড়িয়ে। ডাক্তার দত্তর চেম্বার বাড়িতেই। আবছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও বিল্বকে চিনতে ভুল হলো না। বুঝলাম, ও ডাক্তার দত্তকে দেখাতে এসেছে। চেঁচিয়ে বললাম, 'এই বিল্ব, দাঁড়া'—আমার ডাক শুনে বিল্ব নড়েচড়ে উঠল। কাছে যেতে দেখি গাছতলায় ও নেই। ডাক্তার দত্তর চেম্বারে ঢুকলাম। সেখানেও বিল্বকে দেখতে পেলাম না। রাস্তায় নেমে পাশের গলিতে গেলাম। কানাগলি। শুনসান রাস্তা। সেখানেও কাউকে দেখতে পেলাম না। মনটা দমে গেল বিল্বর ব্যবহারে। বারবার আমাকে দেখেও ও কেন যে পালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। তুলসীবাবুর ডেরায় আর যাওয়া হলো না। বাড়িতে ফিরে এলাম।

পরের দিন খুব ভোরে বহরমপুর থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা তার ছোট ছেলে আর এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির। ছেলেটি মাধ্যমিকে ভাল ফল করেছে। কাকার ইচ্ছে, ছেলেকে কলকাতার কোন নামী কলেজে ভর্তি করা। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিল্বর কথা মনে পড়ে গেল। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে জুন মাসের তেইশ তারিখে। বিল্বর মেয়ে মাধ্যমিক দিয়েছিল। তবে কি মেয়েটা ফেল করেছে! তাই বিল্ব লজ্জায়

আমাকে এড়িয়ে চলছে। কিন্তু তাই বা কেন হবে ? মেয়ের পাস ফেলের সঙ্গে আমাকে এড়িয়ে যাবার কী সম্বন্ধ ? হঠাৎ আমার চিন্তার ছেদ পড়ল। তবে কি বিল্ব মিথ্যে বলে টাকা ক'টা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে ? সত্যি কি ওর মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি ! অসম্ভব নয়। বিল্ব আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলেও রক্তমাংসের মানুষ তো। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, এ কথা কে না জানে।

কিন্তু তখনো আমার বিল্বকে জানতে কিছুটা সময় বাকি। কাকা ভেতরের ঘরে যেতে আমি ফের সোফায় গা এলিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে লাগলাম। খানিক বাদে আমার কলিং বেলের আওয়াজ। বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতে দেখি, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। সঙ্গে দশ এগারো বছরের একটি ছেলে। ছেলেটির গায়ে একটা আনকোরা মার্কিনের কাপড় জড়ানো। খালি পা। হাতে একটা পাকানো কুশের আসন। গলায় ধড়া। তাতে ঝুলছে একটা লোহার চাবি।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। শহীদনগর থেকে আসছি। আগামীকাল বিল্ববাবুর কাজ। ওঁর স্ত্রী বারবার করে বলে দিয়েছেন, আপনাকে একবার যেতে হবে।'

'সে কী' বিল্ব মারা গেছে! কবে ?'—বলতে গিয়ে আমার গলার স্বর চিরে গেল।

'গত মাসের পঁচিশ তারিখ, সকাল আটটায়। তার আগের দিন মাঝরাত থেকে হঠাৎ রক্তবমি শুরু করলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই সব শেষ—'

আমি বজ্রাহতের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর বড় মেয়ে কি পাস করেছে ?'

হ্যাঁ, সেকেণ্ড ডিভিসনে।'—একটু থেমে মলিন হাসলেন ভদ্রলোক। ফের বললেন, বিল্ববাবু মারা যাবার আগে মেয়ের পরীক্ষার ফল জেনে গিয়েছিলেন। এইটুকু যা সান্ত্বনার—'

শুনে আমার মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তবে কি বিল্ব নিজের কথা রাখবার জন্য মৃত্যুর পরেও গত ক'দিন মেয়ের পরীক্ষার পাসের খবরটা জানাবার জন্য রাস্তায় আমাকে দেখা দিতে চেয়েছিল? আর ভাবতে পারছিলাম না আমি। সব কেমন যেন আস্তে আস্তে তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল আমার ভেতরে।



ভৌতিক

নৌকোটা ডাইনে ঘুরতে বাইনাকুলারটা সামনের দিকে বাগিয়ে ধরে রুদ্রাক্ষ বলে, 'ওদিকের চরটায় অত লোকজনের ভিড় কেন মিঃ চৌধুরী?'

সময় সকাল আটটা। মাঝারি সাইজের নৌকো। নৌকোয় যাত্রী সংখ্যা সাত। চারজন কনেস্টবল। একজন দৈত্যাকার লোক। গায়ে চক্করবক্কর হাওয়াই শার্ট। চোখে রোদ-চশমা। ডান হাতে ঘড়ি। এছাড়া রয়েছে ভগবানগোলা থানার ও. সি. কান্তি চৌধুরী ও রুদ্রাক্ষ।

কান্তি চৌধুরী আর রুদ্রাক্ষ ছইয়ের বাইরে বসে অঘ্রাণের মিঠে প্রভাতী রোদ মাখছিল আর দু'ধারের প্রাকৃতিক শোভা দেখছিল।

নদীর নামটি বড় মিষ্টি, কলকলি। একটু দূরে ঝকঝকে বাঁকা কাস্তের মত পদ্মা নদী। ডাইনে আরো একটি নদী। নাম ভৈরব। জায়গাটা লালগোলার কাছাকাছি। পদ্মা আর তার দুই শাখা নদী ভৈরব এবং কলকলি এই তিন জলধারা মিলে এইদিকে পরপর অনেকগুলি চরের সৃষ্টি করেছে।

এলাকাটা রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পদ্মার ওপারেই বাংলাদেশ। সোজা ওপারে প্রেমতলি ঘাট। একসময় বৈষ্ণবদের একটা বড় আখড়া ছিল। এখনও বছরে একবার বিরাট মেলা বসে ওখানে। প্রেমতলিঘাটের ডাইনে দিগন্তে ডুবে যাওয়া ধানক্ষেতের ওধারে বিখ্যাত রাজশাহী শহর। দিনের বেলাতে দেখা না গেলেও রাতে ওই শহরের বৈদ্যুতিক আলোর মালা এধার থেকেও দেখা যায়।

এপারে ভারত। অর্থাৎ এটা সীমান্ত এলাকা। ফলে এসব চরগুলি চোরাচালানের বড় ঘাঁটি। আর এই সুবাদেই ভারত সরকারের অনুরোধে রুদ্রাক্ষর এখানে আসা। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চোরাই চালানকারি বা স্মাগলার গণেশপ্রতাপ। জাতিতে

নেপালী। তিনদিনের অক্লান্ত চেষ্টার পর কাল মাঝরাতে ইসলাম-বাজার চকের এক গুপ্ত আস্তানায় হানা দিয়ে গণেশপ্রতাপকে গ্রেপ্তার করে রুদ্রাক্ষ নদীপথে ফিরছে। ইসলামবাজার চক হল মুর্শিদাবাদ জেলার সবচেয়ে বড় সিল্ক বিক্রয় কেন্দ্র।

আপাতত ওরা যাবে আখেরীগঞ্জে। সেখান থেকে টমটম জাতীয় ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে ভগবানগোলা। ভগবানগোলা থেকে বহরমপুর। সেখানে স্পেশাল পুলিশের হাতে গণেশপ্রতাপকে জমা দিয়ে রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে কলকাতায় ফিরবে রুদ্রাক্ষ।

রাত্রি জাগরণের ফলে একটু ঝিমুনির মত এসেছিল কান্তি চৌধুরীর। রুদ্রাক্ষর ডাকে তিনি নড়েচড়ে চোখ মেললেন। বাইনাকুলারটা রুদ্রাক্ষ কান্তি চৌধুরীর হাতে দিতে তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তাইতো, ওই চরটায় এই সকালবেলা অত লোক কেন? ধানকাটার সময়। আবার কোন গণ্ডগোল হল না তো। কি আপদ! মাঝি নৌকো ভিড়াও—'

বাঁয়ে চর রামকৃষ্ণপুর। ডাইনে চর ডুমুরিয়া। রামকৃষ্ণপুর এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চর। ডুমুরিয়া তুলনায় ছোট। লোকবসতিও কম। ডুমুরিয়ার পুবেই পদ্মা নদী। কান্তি চৌধুরীর কথায় ডুমুরিয়ার ঘাটে পানসী নোঙর করা হল।

ছোট চর হলেও শুধু পলিমাটি দিয়ে তৈরি বলে ডুমুরিয়া রীতিমত উর্বরা। ধানকাটা হয়ে গেছে এখানে। কোথাও কোথাও সরষের চাষ হয়েছে। সেদিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। যেন হলুদের সমুদ্র।

পাড়ে উঠে মাঠের দিকে খানিকটা এগুতে দূরে একটা জটলা দেখা যায়। জনাপঞ্চাশেকের মত লোক জমেছে সেখানে। সবই গাঁয়ের লোক। রুদ্রাক্ষদের দেখতে পেয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ধাঁ শব্দে ছুটে আসে। লোকটা ডুমুরিয়ার চৌকিদার। কাছে এসে কান্তি চৌধুরীকে গড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, স্যার বুদ্ধিশ্বর খুন হয়েছে!'

'কে বুদ্ধিশ্বর?'—মুখ বিকৃত করে প্রশ্ন করেন। তিনদিন যা

ধকল গেছে। তারপর আবার উটকো ঝামেলা। মাথা ঠিক রাখতে পারেন না কান্তি চৌধুরী।

'আজ্ঞে, বুদ্ধিশ্বর পয়রা। সেই পাজি লোকটা। মাস তিনেক আগেই তো লোকটা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে—'

'বুদ্ধিশ্বর! বলো কি!'—কান্তি চৌধুরী আঁৎকে ওঠেন।

'বুদ্ধিশ্বর কে?'—শুধোয় রুদ্রাক্ষ।

'ডেঞ্জারাস্ লোক মশাই!'—কান্তি চৌধুরী চোখ বড় করেন, 'ব্যাটা লাঠিবাজি, দাঙ্গাবাজি করে অনেক জায়গা-জমি করেছে। বছর খানেক আগে রামকৃষ্ণপুরে এক বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খেটে সবে বেরিয়েছে।'

'খুন হলো কি ভাবে?'—যদিও রুদ্রাক্ষও খুব ক্লান্ত। গত তিনদিন তার শরীর—মনের ওপর দিয়েই সবচেয়ে বেশী ঝড় বয়ে গেছে। তবু সখের ডিটেকটিভ তো। অপরাধীকে ধরতে পারলেই তার আনন্দ।' তাই প্রশ্ন করে সে।

'আজ্ঞে স্যার'—চৌকিদার বুঝতে পারে প্রশ্নকর্তা নিশ্চয়ই একজন কেউকেটা ব্যক্তি। বলে, 'কাস্তে দিয়ে ঘাড়ে কোপ মারা হয়েছে। এক কোপেই শেষ।'

'বলো কি! তা খুনী ধরা পড়েছে?'—কান্তি চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ স্যার! একেবারে হাতেনাতে। আর সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার,'—কথা শেষ করতে পারে না চৌকিদার। উত্তেজনায় তার স্বর কাঁপতে থাকে।

'কি রকম?'—কান্তি চৌধুরীর প্রশ্ন।

'একটা বাচ্চা ছেলে মেরেছে বুদ্ধিশ্বরকে। নাম বনমালী। ছেলেটার বাবা পরাণ মণ্ডল এক জোতদারের জমিতে বর্গা খাটে।'—এক নিঃশ্বাসে বলে চৌকিদার।

'দারুণ ইন্টারেষ্টিং কেস তো মিস্টার চৌধুরী। চলুন, একবার স্পটটা দেখে আসি।' বলে রুদ্রাক্ষ সামনের দিকে পা বাড়ায়।

ভিড় ঠেলে অকুস্থলের কাছে পৌঁছুতে দেখা গেল আলের একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা লোক। বিরাট দশাসই চেহারা। লম্বায় ছ'ফুটের ওপরে হবে। গায়ে একটা ফতুয়া। কাস্তের ঘা-টা পড়েছে একেবারে মোক্ষম জায়গায় অর্থাৎ ঠিক ঘাড়ের মাঝখানের হাড়ে। ইঞ্চি তিনেকের মতো গর্ত হয়ে গেছে। তার মানে আঘাতটা পড়বার পর পাঁচ মিনিটের বেশী ধড়ে প্রাণ ছিল না বুদ্ধিশ্বরের। লাশের দুচোখ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বিস্ফারিত। তাতে ভয় আর বিস্ময় মাখানো। কাস্তেটা লাশের পাশেই পড়ে রয়েছে। কাস্তের পাশে থকথকে রক্তের দাগ। সেই সঙ্গে একটু আধটু মাংসের ছিঁটেও লেগে আছে।

মৃত বুদ্ধিশ্বরকে নেড়েচেড়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে রুদ্রাক্ষ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'বনমালী কোথায় ?'

ওদিকে কান্তি চৌধুরী স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা কম নয়। সাত-আটজন চাষী একবাক্যে জানায়—তারা সবাই বনমালীকে বুদ্ধিশ্বরের ঘাড়ে কোপ মারতে দেখেছে।

অদূরে দুজন হুদ্দমুদ্দ লোক একটা ছেলেকে জাপটে ধরেছিল। ছেলেটির বয়স বড়জোর দশ কি এগারো। রোগা হাল্কাপলকা চেহারা। গায়ে একটা ঢলঢলে শতছিন্ন খালি রঙচটা সোয়েটার। পরনে ইজের। গোড়ালি অব্দি শুকনো কাদা। মাথায় ধুলো কুটোকাটা জড়িয়ে আছে। দৃষ্টিতে একটা হতচকিত ভাব। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এত লোকজন দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে।

ছেলেটিকে টানতে টানতে চৌকিদার রুদ্রাক্ষের কাছে নিয়ে এল। রুদ্রাক্ষ প্রথমে ভাল করে ছেলেটিকে জরিপ করে। তারপর নরম গলায় প্রশ্ন করে, 'এখানে কি করছিলে তুমি ?'

রুদ্রাক্ষের স্নেহ-মাখানো প্রশ্নে ছেলেটা যেন একটু বল পায়। চারদিকে ড্যাবডেবে চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে জবাব দেয় বনমালী, 'অই ওখানে ঘাস কাটতে গিয়েছিলুম বাবু।'

রুদ্রাক্ষ বনমালীর কথামত পুবদিকে তাকায়। কিছুটা দূরে একটা ধানখেত। এখনো ধান কাটা হয়নি সেদিকে। জমিটার ওধারে বিরাট জায়গা জুড়ে এক কোমর উঁচু মোত্রাঘাসের জঙ্গল। জঙ্গলের ওধারে পদ্মানদী।

'ঘাস দিয়ে কি করিস?'—প্রশ্ন করেন কান্তি চৌধুরী।

বনমালী উত্তর করবার আগেই ভিড় ঠেলে একজন সামনের দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'রোজ সকালে বনা ওই জঙ্গলেই ঘাস কাটতে যায় কর্তা! ঘরে দু-দুটো দুধেল গাই আছে। মোত্রাঘাস খেলে গাই মিষ্টি দুধ দেয়। তাই—'

'ছেলেটি কে হয় তোমার?'—এবারের প্রশ্নকর্তা রুদ্রাক্ষ।

'আমার ছেলে কর্তা'—পরাণ মণ্ডল বলে।

'তা, হঠাৎ তোমার ছেলে বুদ্ধিশ্বর পয়রাকে খুন করতে গেল কেন?' —আবার বলে রুদ্রাক্ষ।

'কি জানি কর্তা, কেন যে এমন দুর্বুদ্ধি হল ওর।' বলে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে পরাণ, বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরের দিব্যি কাটছি, বনা আমার খুবই আলাভোলা স্বভাবের ছেলে।

'কিন্তু বনমালীই যে বুদ্ধিশ্বরকে খুন করেছে একথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না?'—এবার শুধোয় কান্তি চৌধুরী।

'সে কথা ঠিক কর্তা। নিজের চোখে যখন দেখেছি'—পরাণ মণ্ডল চোখ মুছতে মুছতে বলে।

বনমালীর চোখে-মুখে কিন্তু অপরাধবোধের চিহ্নমাত্র নেই। সে হাঁ করে ওদের কথা শুনে যাচ্ছে।

'কি দেখেছ, একটু খুলে বলবে?'—রুদ্রাক্ষ বলে।

'পাশের জমিটায় আমি ধান কাটছিলুম।'—একটু থামে পরাণ মণ্ডল। বোঝা যাচ্ছে, বলতে ওর কষ্ট হচ্ছে। আবার বলে চলে, 'হঠাৎ বনার বিকট চিৎকারে মুখ তুলে তাকাতে দেখি—মোত্রাঘাসের জঙ্গল থেকে ধা ধা শব্দে কাস্তে উঁচিয়ে ছুটে আসছে বনা। হঠাৎ ছেলেটা বুদ্ধিশ্বরবাবুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর কি যেন

বলতে থাকে। বনার কথা শুনে বুদ্ধিশ্বরবাবু কেমন যেন ঘাবড়ে যান। তারপর ভয় পেয়ে উল্টোমুখো ছুট লাগান। বনাও পেছু নেয়। বুদ্ধি বাবু একটু এগিয়ে হঠাৎ সামনের আলজমিতে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যান। তখন বনা পেছন থেকে কোপ মারে—'

'উফ্, কি ভয়ঙ্কর? একরত্তি ছেলে! তার এই কাজ,'—কান্তি চৌধুরী চেঁচিয়ে ওঠেন।

রুদ্রাক্ষ চুপ করে যায়। দৃষ্টি ভেতরের দিকে গুটিয়ে নেয়। বোঝা যায়, সে এক গুরুতর ভাবনায় ডুব দিয়েছে। খানিকবাদে সে মুখ খোলে, 'আচ্ছা পরাণ, তোমার সঙ্গে কি বুদ্ধিশ্বরের কোন শত্রুতা ছিল?'

'কি যে বলেন কর্তা।'—জিভ কেটে ম্লান হাসে পরাণ মণ্ডল। 'উনি হলেন এই তল্লাটের রাজা। আর আমরা গরীবগুর্বো মানুষ—'

'তাহলে খামোকা কেন বনমালী ওকে খুন করতে যাবে। নিশ্চয়ই এই খুনের পেছনে এমন একটা কারণ আছে যা হয়ত তুমিও জানো না—'

রুদ্রাক্ষর কথা শেষ হয় না। মাঝপথে বলে ওঠে পরাণ মণ্ডল, 'না-না কর্তাবাবু, তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই আমি জানতে পারতাম। তবে—'

'তবে কি!'—ধমকে ওঠেন কান্তিবাবু, 'সব খুলে বলো। নইলে কিন্তু সবশুদ্ধু হাতকড়া পরাবো।'

'গত তিন চার দিন হলো,'—গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেলে যেমন হয় তেমনি হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায় পরাণ মণ্ডল।

'বলো, বলো,'—উত্তেজিত হয়ে ওঠে রুদ্রাক্ষ।

'ছেলেটা রাত্তিরে কেবলই,'—ঢোঁক গিলে কথাটা শেষ করে পরাণ মণ্ডল, 'ঘুমের মধ্যে বুদ্ধিশ্বর' 'বুদ্ধিশ্বর' বলে চেঁচাত।'

'আই সী,'—মাথা নেড়ে ভারি গলায় বলেন কান্তি চৌধুরী, 'নির্ঘাৎ তাহলে কোন কারণে ছেলেটা বুদ্ধিশ্বরের ওপর চটে ছিল।'

'আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয়'—মুচকি হাসে রুদ্রাক্ষ,—

কেউ হয়তো উসকে দিয়ে ছেলেটাকে দিয়ে বুদ্ধিশ্বরকে মার্ডার করিয়েছে।'

'কিন্তু বুদ্ধিশ্বরের এরকম শত্রু ডুমুরিয়াতে কে আছে?'—কান্তি চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

তার কথা শেষ হতে ভিড় থেকে আরেকজন এগিয়ে এসে বলে, 'হ্যাঁ কর্তা, ডুমুরিয়ায় বুদ্ধিশ্বরের একজন শত্রু ছিল বটে। কিন্তু তিনি তো আজ মাস তিনেক হল নিখোঁজ—'

'বুদ্ধিশ্বরের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে না পরে?'—প্রশ্ন করে রুদ্রাক্ষ।

'কয়েকদিন পরে কর্তা।'—ভেবে বলে লোকটা।

'কি নাম তার?'—কান্তি চৌধুরী শুধোন।

'সতীশ পাত্র।'

'পাত্রমশাই কি করতেন?'

'চরের সবাই তো বলে'—একটু থেমে ফের মুখ খোলে লোকটা,—'সতীশ পাত্র বুদ্ধিশ্বরের দলে ভিড়ে গিয়ে ডাকাতি করত।'

'তাই বলুন।'—মুখে হাসি ফোটে রুদ্রাক্ষর।

'তাহলে বুদ্ধিশ্বরের জেল থেকে ডুমুরিয়ায় ফিরে আসার পরই সতীশ পাত্র নিখোঁজ হয়ে যাবার মধ্যে কোন যোগ আছে।'

'ঠিক বলেছেন কর্তাবাবু'—চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে খাটো গলায় ফের বলে লোকটা, 'অনেকে বলে—সতীশ পাত্রই নাকি আগেভাগে পুলিশকে জানিয়ে দিয়ে বুদ্ধিশ্বরকে ধরিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে।'—বলে ওঠেন কান্তি চৌধুরী, 'লোকাল ইনফরমেশন পেয়েই আমরা অন দি স্পট বুদ্ধিশ্বরকে ধরেছিলাম।'

'কিন্তু তিনমাস হয়ে গেল, এইটুকু ছোট চর—'লোকটার কথা মনঃপূত হয় না রুদ্রাক্ষর, 'এতদিন সতীশ পাত্র এখানে কোথায় লুকিয়ে থাকবে?'

'আজ্ঞে কর্তা, সবাই বলে—', লোকটা উত্তর করে, 'সতীশ পাত্র নাকি বুদ্ধিশ্বরের ভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে।'

'আপনার নাম ?'—প্রশ্ন করেন কান্তি চৌধুরী।

'আজ্ঞে, যতীন দাস। আমার জমিতে পরাণ মণ্ডল বর্গা-খাটে।' —যতীন দাস উত্তর করে।

আসামীকে যখন হাতেনাতে ধরা গেছে তখন আর কান্তি চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রুদ্রাক্ষর অনুরোধে মাইল দেড়েক ধানজমি ঠেঙিয়ে তাকেও বুদ্ধিশ্বরের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল। ওরা সঙ্গে দুজন কনস্টেবল নিল। বাকি দুজন রইল নৌকোয়। গণেশপ্রতাপকে দেখবার জন্য!

রুদ্রাক্ষও খুব ক্লান্ত। তবুও একটা মজাদার রহস্যের আঁচ পেয়ে সে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। কেসটার একটা হেস্তনেস্ত করে তবেই সে ফিরে যেতে চায়।

অনেকটা জায়গা নিয়ে বুদ্ধিশ্বরের বাড়ি। চার-দুয়ারী চারখানা ঘর। মাঝখানে উঠোন। উঠোনের একধারে ধানের বিশাল মরাই। লাঙল তিনটি। বলদের সংখ্যাও তিন জোড়া এইরকম অজ জায়গায় বুদ্ধিশ্বরকে রীতিমত বিত্তবান বলা যায়।

বুদ্ধিশ্বরের বড় ছেলে ওদের সামনের ঘরে নিয়ে বসাল। ঘরখানা দরমার বেড়ার হলেও বেশ বড়। ভেতরে দুটো তক্তপোশ জোড়া করা রয়েছে। তাতে সতরঞ্চি পাতা। ঘরের এক জায়গায় লোহার আংটায় একটা বড় খাঁড়া ঝুলছে। কথার ফাঁকে রুদ্রাক্ষ একবার ঘরটা পরীক্ষা করে নিল। ভেতর বাড়ি থেকে তখন কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

ওরা বুদ্ধিশ্বরের ছেলের সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তা বলে উঠে পড়ল। সেসব কথার ভেতর থেকে তেমন কোন সূত্র খুঁজে পেল না রুদ্রাক্ষ।

সেখান থেকে বেরিয়ে ওরা একবার সতীশ পাত্রর বাড়িতে গেল। কান্তি চৌধুরী অস্বস্তিতে গজগজ করছিলেন। ডিটেকটিভের পাল্লায় পড়লে যা হয়। তার ওপর সে যদি সখের ডিটেকটিভ হয় তো আর রক্ষে নেই। রহস্যের সূত্র খুঁজবার জন্য অনাবশ্যক দৌড়-ঝাঁপ করাই এদের স্বভাব। কান্তি চৌধুরী বিরস বদনে রুদ্রাক্ষর সঙ্গ নিলেন।

সতীশ পাত্রর বাড়ি দেখে মনে হল বুদ্ধিশ্বরের তুলনায় তার অবস্থা

অনেক খারাপ। ঘর মোটে একখানাই। মাটির দেয়াল। মাথায় খড়ের চাল! সতীশ পাত্রের তুই মেয়ে। তু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে আছে তার বৌ আর ছোট ভাই। সতীশ পাত্রের বউকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে রুদ্রাক্ষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর ফিরে এসে ব্যস্তসমস্তভাবে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, চলুন, এক্ষুণি বুদ্ধিশ্বরের লাশের কাছে যেতে হবে।'

রুদ্রাক্ষর তুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলছিল।

'কিন্তু রুদ্রাক্ষবাবু, বেলা প্রায় বারোটা বাজতে চলল।'—বিরক্তির সঙ্গে বলেন কান্তি চৌধুরী, কখন আখেরীগঞ্জে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া করবেন।'

'একটা সূত্র যে পেয়ে গেছি কান্তিবাবু।'—মৃত্যু হাসে রুদ্রাক্ষ। আর সেই সূত্রটা এতই ইণ্টারেস্টিং যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'তাই নাকি!'—মুখ ব্যাজার করে শ্লেষের সুরে বলেন কান্তি চৌধুরী।

অকুস্থলে পৌঁছে বনমালীর একটা হাত ধরে রুদ্রাক্ষ বলে, 'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন মিস্টার চৌধুরী। আমি ছেলেটাকে নিয়ে ঘাসজঙ্গলের দিকটা একবার ঘুরে আসছি।'

কান্তি চৌধুরী কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। বনমালীর পিঠে হাত রেখে কিসব বলতে বলতে ওকে নিয়ে রুদ্রাক্ষ পুবদিকে এগোতে লাগল। তারপর একসময় ধানক্ষেত পেরিয়ে ঘাসজঙ্গলে ঢুকে পড়ল। জায়গাটা ধানিজমির তুলনায় নিচু বলে খানিকক্ষণ বাদে দেখা গেল না।

বেশ অনেকটা সময় কেটে গেছে। রোদ্দুরের রঙ ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। এদিকে কৌতূহলী লোকের ভিড়ও পাতলা হয়ে গেছে। সবাই অবাক বিস্ময়ে ঘাসজঙ্গলের দিকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ ঘাসজঙ্গলের আড়াল থেকে রুদ্রাক্ষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রুদ্রাক্ষ বলছে: 'বলো, বলো।······হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর······'

খানিকবাদে ঘাসজঙ্গলের ভেতর থেকে 'বুদ্ধিশ্বর' 'বুদ্ধিশ্বর' বলে বিকট চিৎকার করতে করতে তীব্র-গতিতে ছুটে এল বনমালী ধানজমির

দিকে। অবিশ্বাস্য সেই গতি। অলিম্পিকের একশো মিটার দৌড়কেও যেন হার মানায়।

বনমালীর পেছনে রুদ্রাক্ষকে দেখা গেল। রুদ্রাক্ষকে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ধরো, ধরো ওকে—।'

কান্তি চৌধুরী তার বিশাল বপু নিয়ে এগিয়ে যাবার আগেই একজন কনস্টেবল ছুটে গিয়ে বনমালীকে জাপটে ধরল। তারপর সে কি ধস্তাধস্তি। একরত্তি ছেলে! তার গায়ে যেন অসুরের বল। আরেকজন কনস্টেবল এগিয়ে সাহায্য না করলে বনমালীকে বাগমানানো দায় হয়ে উঠত। শেষপর্যন্ত উপায়ন্তর না দেখে কনে-স্টেবল দু'জন ছেলেটাকে লাথি ঘুসি রদ্দা মেরে মাটিতে শুইয়ে ফেলল। বনমালী মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে বুনো জন্তুর মত গোঙাতে লাগল।

পরাণ মণ্ডল সেই দৃশ্য দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'বনা, আমার বনারে—'

রুদ্রাক্ষ গা থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে নিয়ে পরাণ মণ্ডলের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'কেঁদ না, বাড়ি ফিরে যাও। আমি কথা দিচ্ছি মাস দুই-তিনেকের মধ্যেই তুমি বনমালীকে ফিরে পাবে।'

নৌকো চলেছে আখেরীগঞ্জের দিকে। বাইরে রুদ্রাক্ষ আর কান্তি চৌধুরী বসে। ছইয়ের ভেতরে গণেশপ্রতাপ। তার হাতে হাতকড়া। পাশে চারজন কনেস্টবল এবং বনমালী। বনমালীর তখনো জ্ঞান ফেরেনি।

আসল ব্যাপারটা কি খুলে বলবেন রুদ্রাক্ষবাবু!'—অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করেন কান্তি চৌধুরী।

শীত-দুপুরের আলোয় লক্ষকোটি হীরা জ্বলছে কলকলির জলে। ক্লান্তিতে রুদ্রাক্ষ অবশ। সে কান্তি চৌধুরীর কথায় নড়েচড়ে বসে। তারপর বলতে থাকে, 'এ ধরনের কেসের মুখোমুখি হবার সৌভাগ্য সব ডিটেকটিভের হয় না কান্তিবাবু। ডুমুরিয়াকে ধন্যবাদ। পাকেচক্রে ওদিকে গিয়ে না পৌঁছলে এমন এমটা ইন্টারেষ্টিং মার্ডারের ফয়সালা করার সুযোগ হয়ত কোনদিন পেতাম না।'

'কিরকম' ?—রুদ্রাক্ষর দিকে ফিরে আঁট হয়ে বসেন কান্তি চৌধুরী।

সবিস্তারে বলতে থাকে রুদ্রাক্ষ.—'ঘটনাস্থলে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কাস্তের কোপটা মারাত্মক ধরনের। বনমালী তো দূরের কথা বুদ্ধিশ্বরের মত অতবড় দশাসই মানুষটার ঘাড়ে যে প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে কোপটা মারা হয়েছে তা আমার কিংবা আপনার পক্ষেও সহজ কাজ নয়। ডেডবডির চোখ দুটো দেখে আরো বিস্মিত হলাম। মৃত বুদ্ধিশ্বরের চোখে ভয় আর বিস্ময় যেন একসঙ্গে জমাট বেঁধে আছে। গোবেচারা একরত্তি ছেলে বনমালীকে দেখে তো বুদ্ধিশ্বরের মত লোকের ভয় পাওয়া উচিত নয়।'

'তারপর আরেক রহস্য! বনমালীর চোখ-মুখ দেখে মনে হল, এ তো হত্যাকারীর চোখ-মুখ নয়। যে হত্যা করে সে যতই পাষণ্ড হোক না কেন হত্যার পরমুহূর্তে ধরা পড়ে গেলে খানিকটা ঘাবড়ে যাবেই। ভয়ে তার দৃষ্টি পাল্টাবেই। অথচ বনমালীই যে খুন করেছে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপর যখন পরাণ মণ্ডল ঘুমের মধ্যে বনমালীর 'বুদ্ধিশ্বর' 'বুদ্ধিশ্বর' বলে চেঁচিয়ে ওঠার ঘটনাটা বলল তখন আমার ভাবনা-চিন্তা সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তারপর, অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ছুটলাম বুদ্ধিশ্বরের বাড়ির দিকে। সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে একটা সূত্র খুঁজে পেলাম। বসবার ঘরে গিয়ে দেখলাম—বেড়ায় একটা বিশাল খাঁড়া ঝুলছে। পরীক্ষা করতে চোখে পড়ল—খাঁড়ার গায়ে কালচে রক্তের দাগ। দেখেই কেন যেন মনে হল—বেশ কিছুদিন আগে ওই খাঁড়াটা দিয়ে কোন মানুষকে খুন করা হয়েছে। একে আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুমানশক্তিও বলতে পারেন। তক্ষুণি আমার ভাবনা নতুন দিকে বাঁক নিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ছুটলাম সতীশ পাত্রের বাড়ির দিকে।

'সতীশ পাত্রর বাড়িতে পৌঁছে আর একটা ক্লু পেয়ে গেলাম। সতীশের স্ত্রী যা বলল তাতে আমার দৃঢ় ধারণা হল সতীশ পাত্র বেঁচে নেই। ওর বাংলাদেশে পালিয়ে যাবার ঘটনা আসলে ওর শত্রুপক্ষের মিথ্যে রটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সতীশ পাত্র বেঁচে থাকলে গত তিনমাসের

ভেতর কোন না কোন ভাবে সে নিজের থাকার খবরটা স্ত্রীকে জানাতই। তাহলে কে সতীশ পাত্রের সেই মিথ্যে রটনাকারী শত্রু। সতীশ পাত্রের স্ত্রীর অনুমান—বুদ্ধিশ্বর পয়রাই সতীশকে সাবাড় করেছে। আর সেটা অস্বাভাবিকও নয়। একসময় সতীশ পাত্রই তো বুদ্ধিশ্বরকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে আমার অনুসন্ধানের পথটা এক নতুন দিকে বাঁক নিল। আপনি জানেন মিস্টার চৌধুরী, শুধু বুদ্ধি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। সুতরাং এরপর আমি বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে এক নতুন পথে অগ্রসর হতে চাইলাম। বিশ্বাস করুন, হত্যার কিনারা করতে গিয়ে এরকম এক্সপেরিমেন্ট আমি জীবনে আর কখনো করিনি—'

'মূল ঘটনাস্থলে ফিরে এসে বনমালীকে নিয়ে গেলাম মোত্রাঘাসের জঙ্গলের দিকে। বারবার কাটা রেকর্ডের মত একটাই কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম ওকে : বলো, বলো বনমালী, কেন তুমি বুদ্ধিশ্বরকে খুন করলে।—আমার কথায় ছেলেটা ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। শেষে ঘাসজঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এক জায়গায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বনমালী চেঁচিয়ে উঠল : এই যে! ছ্যাখো, ছ্যাখো!—বনমালীর দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। প্রচণ্ড ক্রোধে শরীরটা ফুলে উঠছিল। আর ওর কণ্ঠস্বর! কি অস্বাভাবিক। যেন বয়স্ক কেউ একজন কথা বলছে।

ওর কথামত আমি নিচু হয়ে তাকাতে দেখি ঘাসজঙ্গলের ঠিক ওই জায়গাটাতেই একটা নরকঙ্কাল জলকাদায় পড়ে আছে। কঙ্কালটা নড়াচড়া করতে লক্ষ্য করলাম—হাড়ের বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষতচিহ্ন। অর্থাৎ এমন কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে যা শুধু ধারালোই নয় অত্যন্ত ভারিও বটে। তাহলে সেই অস্ত্রটা কি। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিশ্বর পয়রার বসবার ঘরের খাঁড়াটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।'

'সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বনমালীর দিকে তাকাতে আঁৎকে উঠলাম। বনমালী তখন অন্য মানুষ। কে বলবে সে একটা পুঁচকে ছোকরা। কোন বাচ্চা ছেলে উত্তেজিত হলে যে এত বলশালী হয়ে

উঠতে পারে তা ছিল আমার ধারণার বাইরে। চোখ দুটো প্রতিহিংসায় আদিম জন্তুর মত লাল টকটকে হয়ে উঠল। প্রবলভাবে ফুঁসে উঠে হুংকার ছাড়ল ঃ বুদ্ধিশ্বর! বুদ্ধিশ্বর! —আমি ওকে শান্ত করতে চাইলাম। কিন্তু তখন ওর গায়ে দৈত্যের বল। আমাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে ধানক্ষেতের দিকে দৌড়াতে লাগল।'

সব শুনে কান্তি চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এই ঘটনা থেকে আপনি কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন সেটা যদি খুলে বলেন—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ সেখানেই তো আসল রহস্য। সেই রহস্যের পুরোটা, সত্যি বলতে কি মিস্টার চৌধুরী, এখনো আমি বুঝতে পারিনি।'

'মানে?'

'খুব সম্ভবত,' থেমে থেমে বলতে লাগল রুদ্রাক্ষ, 'আজ থেকে তিনমাস আগে বুদ্ধিশ্বর যখন সতীশ পাত্রকে ওই মোত্রাঘাসের জঙ্গলে খুন করে তখন কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বনমালী ব্যাপারটা দেখে ফেলে। বালক-মনে সেই নৃশংস খুনের প্রতিক্রিয়া হয়। সেটা জমতে জমতে আজ সকালে হঠাৎ বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ে। যার পরিণাম এই খুন। কিংবা—'

'থামলেন কেন রুদ্রাক্ষবাবু, বলুন—' কান্তি চৌধুরী অধীর গলায় বললেন।

আবার এমনও হতে পারে, যদিও আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি না,' বলতে বলতে বিহ্বল হয়ে পড়ে রুদ্রাক্ষ, 'ওই ঘাস জঙ্গলে দিনের পরদিন ঘুরে বেড়াবার সময় সতীশ পাত্রর প্রেতাত্মা একসময় বনমালীর ওপর ভর করে। তারপর একটু একটু করে ছেলেটাকে প্রভাবিত করতে থাকে। অবশেষে আজ সকালে বনমালীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে সতীশ পাত্রর অশরীরী প্রেতাত্মা প্রতিহিংসায় অধীর হয়ে বনমালীর ওপর ভর করে তার খুনের বদলা নেয়।

'স্ট্রেঞ্জ। এরকম ঘটনাও ঘটে নাকি।'—বলতে গিয়ে কান্তি চৌধুরীর গলা বসে যায়।

'হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী, পৃথিবীতে এখনও এমন ঘটনা ঘটে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।' বড় একটা হাই তুলে ফের বলে রুদ্রাক্ষ, 'আপাততঃ আপনি বনমালীকে বহরমপুরের ব্রস্টেল বা শিশু অপরাধীদের জেলখানায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন, আর আমি কলকাতায় ফিরেই একজন সাইকিয়াট্রীস্ট মানে মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলব। তারপর বনমালীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে শুরু হবে এক বিস্ময়কর চিকিৎসা।

পানসী নৌকোর পেছনে একটা ছোট নৌকো। তাতে বুদ্ধিশ্বর পয়রার লাশ নিয়ে বসে আছে চৌকিদার।

খানিকবাদে দৃষ্টির সামনে আখেরীগঞ্জ ভেসে উঠল।



বিমলের সঙ্গে কিছুক্ষণ

নির্জন প্ল্যাটফরমে আমরা জনা কয়েক যাত্রী নামলাম। রাত সাড়ে আটটা হবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়। তার ওপর আকাশ কাজলি-ছাই মেঘে ঢাকা। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা ঝরেও গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল।

টিকিট-ঘর ছাড়লেই রাস্তা। রাস্তার ওধারে গুটিকয় চালাঘরে টেমি জ্বলছে। যাত্রীদের জন্য চা পান বিড়ির দোকান আর কি।

টমটম ছিল একটাই। যাবে আখেরীগঞ্জে। অর্থাৎ আমার গন্তব্য-স্থলের উলটো দিকে। অনেক করে বললাম। ফল কিছুই হল না। ঘোড়ার লেজ মুচড়ে গাড়োয়ান মুখে অদ্ভুত এক শব্দ করল। তারপর দেখতে দেখতে সওয়ারি বোঝাই গাড়িটা হা-হা করা অন্ধকার মাঠের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। হঠাৎ চালাঘরগুলোর দিক থেকে একজন এগিয়ে এল। ঘোমটার মত করে চাদরে মোড়া মুখ। বলে উঠল, 'তরুণ না?'

লোকটার সঙ্গে কালো মিশমিশে রঙের একটা হৃষ্টপুষ্ট দেশী কুকুর। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। গলার স্বরে চিনতে পেরে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠলাম, 'বিমল, তুই!'

'হ্যাঁ', গম্ভীর গলায় বিমল বলল, 'ছেলেবেলা থেকেই তো তোকে চিনি। কথা দিয়ে ঠিক সময়ে আসা তোর স্বভাবে নেই। তাই আজো এসেছি।'

খোঁচাটা নীরবে হজম করতে হল। গতকাল কলকাতা থেকে এই ট্রেনেই আমার আসার কথা ছিল। হঠাৎ কাল অফিসের একটা জরুরী কাজে আটকে পড়ায় আসতে একদিন দেরী হয়ে গেল। সিগারেট ধরিয়ে একটা ওর দিকে এগিয়ে দিতে বিমল বলল, 'না,

খাব না। ক'দিন ধরে জোর সর্দিকাশিতে ভুগছি। মাঝে আবার ঘুসঘুসে জ্বরও হয়েছিল।'

আমরা পুবমুখো এগুতে লাগলাম। কুকুরটা আগে আগে চলছে। অন্ধকার পথ। একদিকে ধু-ধু ফসলকাটা মাঠ। আরেক দিকে ঘন গাছগাছালি। এক সময় বিমল বলল, মাফলার-টাফলার কিছু আনিস নি?'

'এনেছি।'

'তাহলে গলাটা পেঁচিয়ে নে।' কথাটা শেষ করে খুক খুক করে খানিকটা শুকনো কাশল বিমল।

তুলোর মোটা গেঞ্জির ওপর সার্জের শার্ট। তার ওপর সোয়েটার, পুলওভার। বললাম, 'আবার কিডব্যাগ খুলব। কতটুকুই বা পথ।'

বিমল ধমকে উঠল, 'ফালতু গোয়ার্তুমি করিস না তরুণ। যা উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। একবার বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে আর রক্ষে নেই।'

দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিডব্যাগটা কাঁধ থেকে খসিয়ে নিয়ে বললাম, 'টর্চ আনিস নি?'

'না।'—অন্ধকার। তার ওপর চাদরে মোড়া মুখ। ভাল করে ওকে দেখতেও পাচ্ছিলাম না। বিমল বলল, 'আসার সময় ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। কি করে বুঝব যে হঠাৎ মেঘ করবে।'

চেন খুলে হাতড়ে মাফলার বের করে গলাটা ঢেকে নিলাম। তারপর ফের চলতে চলতে এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর কোয়াটার আর কদ্দূর রে?'

'কোয়াটার, এই পাড়াগাঁয়ে! হাসালি তরুণ।'—সর্দিবসা গলায় বলল বিমল।

'তাহলে থাকিস কোথায়?'

'অফিস বাড়ির একটা ঘরে। আর মাইলখানেক পথ হবে।'

'রান্নাটান্না কে করে দেয়?'

'কে আবার। একজন লোক রেখেছি। সে-ই যা'হোক করে রেঁধে দেয়। কাল তুই আসবি বলে মুরগী কেটেছিলাম।'

সেটেলমেণ্ট অফিসের মোটামুটি ভাল মাইনের চাকুরে বিমল। জমির মাপজোপ করে। কন্নুনগো। আগে পোস্টেড ছিল ডায়মণ্ডহারবারে। বছরখানেক হল বদলি হয়ে ভগবানগোলায় এসেছে। বিয়েথা এখনো করে নি। বাড়ির লোকজন থাকে দমদমে। সপ্তাহে একদিন করে বাড়ি যায়। এখানে বদলি হবার পর থেকে চিঠি লিখে উত্যক্ত করছে আমাকে। দিনকতক ওর সঙ্গে কাটিয়ে যাবার জন্য।

হঠাৎ কুকুরটা বিশ্রীভাবে চেঁচাতে শুরু করলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, 'কুকুরটা নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে। নইলে চেঁচাচ্ছে কেন?'

'কি আবার দেখবে',—বলে বিমল ডাকল, 'রুস্তম, এদিকে আয়।'

'না, মানে—সাপটাপ কিংবা অন্য কোন জন্তু। যা অন্ধকার—'

'এই শীতে সাপ বেরোয় না',—বলে খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল বিমল, 'আর হিংস্র কোন জন্তুটন্তু এদিকে নেই। তবে—'

সামনের অন্ধকার থেকে রুস্তম ছুটে এসে বিমলের পাশে দাঁড়াল। কুকুরটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

'তবে কি?—আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম।

'কিছু না, চল্—' বলে হাঁটতে শুরু করল বিমল।

'বল্ না কি?'—আমি নাছোড়বান্দা।

বাঁদিকের ডালপালাওলা ঝুপসিমত একটা গাছ থেকে হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল।

বিমল বলল, 'কি আবার। শুনেছি, এমনি অন্ধকার রাতে নাকি এদিকে প্রেতলোকের বাসিন্দারা মাঝে মধ্যে হাওয়া খেতে বেরোয়।

'মানে?'—ভাঙা গলায় শুধালাম।

'ইতিহাসে ভগবানগোলার কথা পড়িস নি? এইখানেই তো সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েছিল।'—বিমলের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ঠেকল।

তাতে কি হয়েছে?'

'না, কিছু হয় নি। তবে ঐতিহাসিক জায়গা তো। এক সময়ে এখানে যুদ্ধে অনেক পাঠান সৈন্য মারা যায়। কেউ কেউ বলে

সেইসব যোদ্ধাদের প্রেতাত্মারাই নাকি,—অবশ্য এসব শোনা কথা।'

'তুই কখনো কিছু দেখেছিস?'

'না। তবে রুস্তমের পক্ষে দেখাটা অসম্ভব নয়।'

'কেন?'

এক ঝাঁক বাদুড় ডানা ঝাপটিয়ে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ছপছপ শব্দে উড়ে চলে গেল।

'সাধারণ লোকের ধারণা, কুকুরেরা নাকি অন্ধকারে প্রেতাত্মাদের দেখতে পায়।'—ওর কথাগুলো আমার সারা শরীরে যেন বরফ গলা জল ঢেলে দিল। ও ফের বলল, 'যেতে দে ওসব কথা। বল, কদ্দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস?'

'রোববার রাতের ট্রেনে ফিরে যাব।'—উত্তরে বললাম।

'সে কি, মোটে দুদিন! এখানে কত কিছু দেখার আছে জানিস?'

'কি কি আছে?'

'কাল সকালেই প্রথমে তোকে নিয়ে আখেরীগঞ্জে যাব। সেখান থেকে নৌকো ভাড়া করব। কলকলি নদী ধরে পড়ব পদ্মায়। পদ্মার ধারে বড় বড় কয়েকটা চর আছে। রামকৃষ্ণপুর, ডুমুরিয়া, শাহুর চর ইত্যাদি।

'ওপারে বাংলাদেশ। রাতে নৌকো থেকেই রাজশাহী শহরের আলো দেখতে পাবি। আর পদ্মার কি রূপ! একেবারে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেবে। একটা পুরো রাত পদ্মার ওপর কাটিয়ে পরের দিন ভৈরব নদীতে পড়ব। তারপর সোজা চলে যাব ইসলামবাজার চকে। ওখানে সিল্কের কাপড়ের মস্ত বাজার বসে।'

একে শীত কাল। তার ওপর অন্ধকার পথ। বিমলের কোন কথাই আর আমার মাথায় ঢুকছিল না। ভাবছিলাম কতক্ষণে ওর ডেরায় পৌঁছুব। বললাম দায়সারা, 'কিন্তু সোমবার যে আমাকে অফিসে জয়েন করতেই হবে। যা কড়াকড়ি চলছে'—

'থাক্, হয়েছে। আমাকে আর তুই অফিস দেখাস না। চার

পাঁচ দিনের আগে আমি তোকে কিছুতেই ছাড়ছি না। কদ্দিন বাদে দেখা হল বল্ তো।'—ছেলেবেলার মতই জোর দিয়ে কথা ক'টা বলল বিমল।

হঠাৎ ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যে খসখস আওয়াজ। তারপর কান্নার শব্দ। অবিকল পেটরোগা বাচ্ছাদের মত সুরে।

আমি ফের দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। বললাম দমচাপা গলায়, 'শুনতে পাচ্ছিস বিমল। জঙ্গলের ভেতর কেউ কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে না?'

'ও কিছু না। গাছের মগডালে বসে শকুন ডাকছে। ওদের ডাক অমনি হয়,' বলে বোধহয় বিমল হাসল, 'তুই দেখছি বেজায় ভিতু হয়ে গেছিস। আগে তো এরকম ছিলি না তরুণ।'

ওর কথাটা সত্যি। ভয়ডর আমার কোনকালেই ছিল না। তবে কিনা বহুকাল হল এরকম পরিস্থিতিতে পড়ি নি বলেই খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য প্রশ্ন করলাম, 'তোর অফিসবাড়ি আর কদ্দূর?'

'এই তো এসে গেছি। ডানদিকের বাঁকটা ঘুরলেই লেভেল ক্রসিং। তারপর রেললাইন পেরিয়ে দু'পা।'

একটু বাদেই লেভেল ক্রসিং-এর সামনে এসে পড়লাম। মেঘের কানাত ছিঁড়ে কালিপড়া হ্যারিকেনের আলোর মত চাঁদের খানিকটা ফ্যাকাশে আলো গাছের মাথায় উঁকিঝুঁকি মারছিল। অদূরে বিমলের অফিসবাড়িটা দেখা গেল।

লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ওধারে গেছি। হঠাৎ পাশে তাকাতে দেখি বিমল নেই। ও রুস্তমকে নিয়ে ততক্ষণে রেল লাইনে নেমে পড়েছে। আমি বললাম, 'একি, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

বিমল ঝাপসা গলায় বলল, 'তুই গিয়ে—অফিসবাড়ির সামনে দাঁড়া। আমি এখ্খুনি যজ্ঞেশ্বরকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

'যজ্ঞেশ্বর আবার কে?'

'কে আবার, আমার রাঁধুনি।'—বলে বিমল আমাকে কিছু বলার

সুযোগ না দিয়েই রেললাইন ধরে হিম অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে ওর প্রভুভক্ত কুকুর রুস্তমও।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বিমলের পাত্তা নেই। আমি অফিস-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছি। আর মনে মনে ওর মুণ্ডুপাত করছি। একসময় লেভেল ক্রসিং-এর দিকে আলো দেখা গেল। গোটাকয়েক লণ্ঠন। আলোগুলো অফিসবাড়ির কাছেই এগিয়ে এল। জনাকয়েক লোক। প্রচণ্ড শীতেও সকলের খালি পা। ওদের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরও ছিল। ছিল না শুধু একজন। সে বিমল।

আমি তখনো জানি না—গতকাল রাতে রুস্তমকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে গিয়ে আমাকে না পেয়ে ফিরে আসার পথে ওই লেভেল ক্রসিং-এর সামনেই ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তলায় চাপা পড়ে বিমল মারা যায় এবং এরা সবাই ওর শ্মশানবন্ধু।



ভবেশবাবুর বাড়ি ফেরা

বাঁচবার কথা নয়। তবু ভদ্রলোক বেঁচে গেলেন। ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার হাত থেকে। একেই বোধ হয় বলে ভাগ্য।

দেখে ভবেশবাবুর বয়স আন্দাজ করা মুস্কিল। লম্বা, একহারা, সিড়িঙ্গেমার্কা চেহারা। হাঁটেন একটু কুঁজো হয়ে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মাথায় চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। কপালে পরপর অনেক-গুলো ভাঁজ। শরীরের তুলনায় মুখের রঙ বেশ কালচে। রোদে পোড়া মতন। চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠায় গালের দুদিক গর্তে ঢুকে গেছে। কটা চোখ। দেখলেই বোঝা যায় লিভারের গণ্ডগোলে ভুগছেন ভদ্র-লোক। বয়স পঁয়তাল্লিশ হতে পারে। আবার পঞ্চাশ হতেও বাধা নেই।

ভবেশবাবু বছর দুই হল গোড়খাড়ায় আছেন। শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে সোনারপুরে নেমে গোড়খানায় পৌঁছুতে হাঁটাপথে মিনিট পাঁচেকের মত সময় লাগে। ভদ্রলোক আগে থাকতেন ঢাকুরিয়ায়। ভাড়া বাড়িতে। একখানা ছোটঘর। পর-পর দুই ছেলে বুবাই আর ভোলার পর মেয়ে ঝুমরি হলে জায়গার অকুলান হয়। তখন গোড়খানায় কাঠা তিনেকের মত জমি ভবেশ-বাবু কেনেন সস্তায়। তারপর এদিক সেদিক থেকে ধার দেনা করে টালীচাল দুখানা ইটের ঘর তুলে সেখানে চলে যান।

ভদ্রলোকের চাকরিস্থল কলকাতার ডালহৌসী অঞ্চলে। কয়লা-ঘাটার এক আধা সরকারি অফিসে কেরানীর কাজ করেন। কেটেকুটে মাস-মাইনে যা পান তাতে আক্রার বাজারে সংসার চলার কথা নয়। কিন্তু ভবেশবাবু খুব হিসেবী। তাই যা'হোক করে সামাল দিচ্ছেন সবদিক।

আজ মাসের চৌঠা। মাইনের দিন। ফি-মাসের মত আজকেও তিনি ক্যানিং ষ্ট্রীটে গিয়েছিলেন। দুটো পয়সা সাশ্রয়ের জন্য। হরলিকস,

হুইপ্রস্থ সাবান, নারকেল তেলের কৌটো, দাঁত মাজার পাউডার, ব্লেড, জুতোর কালি, ছেলেদের জন্য খাতা কাগজ ইত্যাদি সাতসতের মাস-কাবারি মাল নেহাৎ কম নয়। তারপর, ট্রামে বাসে যা ভিড়, পকেটে কয়েকশ' টাকা,—ক্যানিং স্ট্রীট থেকে ভবেশবাবু হেঁটেই ফিরছিলেন শিয়ালদয়।

স্বভাবে ভদ্রলোক ভিতু। তাই চলাফেরার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সতর্ক। কিন্তু, আজ তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আর তক্ষুনি দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। শিয়ালদর চৌরাস্তার মোড়ে এসে হঠাৎ তার বুবাইর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সকালে অফিসে বেরুবার আগে তিনি দেখে এসেছিলেন—ছেলেটার জ্বর দুই-এর কিছু বেশি। কলকাতা থেকে গোড়খানার দূরত্ব খুব একটা না হলেও একেবারেই গণ্ডগ্রাম। ভবেশবাবুর বাড়ির পুবে মস্ত ধু-ধু ধানখেত। মাসখানেক হল বর্ষার জলে টইটম্বুর। পাড়ায় বাঁদর ছেলের অভাব নেই। দলে পড়ে দিনকতক বুবাই ধানখেতে নেমে বর্ষার নতুন কইমাছ ধরেছে। ব্যস, আর যায় কোথায়। পড়েছে জ্বরে। মাসের শেষ। পকেট গড়ের মাঠ। ভবেশবাবু টুকটাক হোমিওপ্যাথী জানেন। ক'দিন নিজেই ওষুধ দিয়েছেন। কাল রাতে বউ শেফালী বলেছে, 'সাত আট দিন হয়ে গেল। ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না কিছুতেই। ভাল বুঝছি না। এবার একজন ডাক্তার দেখাও।'—মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে ভবেশবাবুও ঘাবড়ে গেছেন রীতিমত। বৃষ্টিবাদলার দিন। ঘরে ঘরে টাইফয়েড।

হাতঘড়িতে চোখ পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন ভবেশবাবু। সাতটা বেজে পঁচিশ। হাতে আর মোটে মিনিট পাঁচেকের মত সময়। যে করেই হোক ট্রেনটা ধরতে হবে। মতি মিত্তিরের চেম্বার সোনারপুর স্টেশনের গায়েই। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। মতি মিত্তির সোনারপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার।

আর ওই চটজলদি ভাবনাটাই হয়েছিল কাল। দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ভদ্রলোক লাগিয়েছিলেন ছুট। একেই শিয়ালদর মোড়

বিপজ্জনক। ট্রাম বাস লরী টেম্পো ভ্যান রিক্সা ঠেলাগাড়ির ভিড় অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। তার ওপর ঘরমুখো অফিসফেরতা ট্রেন যাত্রীর হুড়োহুড়ি। পড়েছিলেন গিয়ে সোজা এক ডবলডেকারের মুখে। বগলে ছাতা, দুহাতে দুটো মালভর্তি পলিথিনের ব্যাগ, পথ-শ্রমে ক্লান্ত শরীর। তবু হয়ত ভবেশবাবু নিজেকে সামলে নিতে পারতেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পেছন থেকে একজন ধাক্কা মারতে টাল রাখতে পারেন নি। চোখের নিমেষে সেঁধিয়ে গিয়েছিলেন যন্ত্রদানবটার গহ্বরে। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে একটা রক্ত হিম-করা আওয়াজ ফুঁসে উঠেছিল, 'গেল, গেল..........'

হ্যাঁ, অবিশ্বাস্যভাবেই বেঁচে গেলেন ভবেশবাবু। একেই বলে কপাল। রাক্ষুসে চাকাটা তাকে দাঁতাল বুকের নিচে ফেলতে গিয়েও একধারে ঠেলে দিল। অর্থাৎ দুই চাকার মাঝখানের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় গিয়ে ছিটকে পড়ল ভবেশবাবুর দেহ। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভদ্রলোকের চিন্তাভাবনা, বোধশক্তি সব স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ করে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেলে যেমন হয়। এদিকে ততক্ষণে গজ দুই কি তিন এগিয়ে গিয়ে গুলিবেঁধা বিশাল পাগলা হাতির মত বিকট আর্তনাদ করে থেমে গেছে ডবল ডেকারটা।

মুণ্ডু আর ধড় ফের জুড়ে যেতে খেয়াল হল ভবেশবাবুর—তিনি যন্ত্রদানবের একেবারে পেছনের দিকে পৌঁছে গেছেন। তার বুকের ভেতর ধ্বক ধ্বক শব্দে একটা প্রকাণ্ড মালগাড়ির ইঞ্জিন ছুটে যাচ্ছিল। আত্মস্থ হয়ে তিনি কনুয়ের ওপর ভর রেখে আড়চোখে বাসের তলা থেকে দেখতে পেলেন—পিল্‌পিল্ করে শত শত মানুষের ছুটন্ত পা ক্রমশ বাসের চারদিকে জড়ো হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে কানে তালা লাগানো চিৎকার হট্টগোল।

এরকম নিদারুণ বিপদেও কিন্তু ভদ্রলোক বুদ্ধি হারালেন না। ইচ্ছা করলে তখনই তিনি অনায়াসে হামাগুড়ি দিয়ে বাসের তলা থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পারতেন। কিন্তু বেরুলেন না চট করে। কলকাতার মারমুখী, খ্যাপা মানুষজনকে তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন।

তিনি জানেন, ঝট্ করে বেরিয়ে পড়লেই সকলের দৃষ্টি পড়বে তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে থাকবেন। কেউ কেউ তাকে ধমকাবে, মুখখিস্তি করবে। মওকা পেয়ে কেউ হয়ত দু'চার ঘা বসিয়েও দেবে। সবচেয়ে বড় ভয় পুলিশের। তাকে ধরে নিয়ে যাবে থানায়। কোন রকমে যদি তিনি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন তাহলে তো আর কথাই নেই। আত্মঘাতী ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনার আগে ধরা পড়ে যায় তাহলে মাসকয়েকের জন্য হাজতবাসও হয়ে যেতে পারে।

তাই বেশ কিছুটা সময় ভবেশবাবু ঘাপটি মেরে পড়ে রইলেন বাসের তলায়। তারপর একসময় দেখেশুনে বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ভিড়টা চারপাশ থেকে পাতলা হয়ে সামনের দিকে জড়ো হয়েছে। জনা কয়েক অতি উৎসাহী ছোকরা মাডগার্ডে উঠে হাত বাড়িয়ে ড্রাইভারকে সীট থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামাবার চেষ্টা করছে। তখন কে বাসের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এল কি না এল কে তা দেখতে গেছে।

ভবেশবাবু গুটিগুটি হেঁটে পাসের ফুটপাতে উঠে পড়লেন। তাজ্জব ব্যাপার। এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও শরীরে তার কোন জ্বালাযন্ত্রণা নেই। এমন কি, নিজেকে ভাল করে দেখলেন তিনি, কোথাও রক্তপাত তো দূরের কথা সামান্য কেটে-ছিঁড়েও যায় নি। শরীরটা তুলোর মত হাল্কা লাগছে। পরক্ষণেই কারণটা ধরতে পারলেন ভবেশবাবু। তাই তো, একেবারে ঝাড়া হাত-পা তিনি। ছাতা, দু'দুটো পলিথিনের ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র মায় হাতঘড়ি, চশমা পর্যন্ত লোপাট। 'হায়-হায়' করে উঠলেন ভদ্রলোক। নিজের কথা ভাববার মত আর ফুরসুৎ নেই তার। বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ফের রাস্তায় নেমে পড়লেন।

ট্রাফিক পুলিশ এসে ড্রাইভারকে নামিয়ে নিচ্ছে। নানাজনে নানা-রকম উটকো মন্তব্য করছিল। একজন বলছে, 'সত্যি, দিনে দিনে কলকাতারপথঘাট যা হয়ে উঠেছে তাতে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরাই দায়।' —কেউ বলল, 'একেবারে খতম হয়ে গেছে। ডবলডেকারের তলায়

পড়লে কি আর বাঁচে।'—আরেকজন তার কথায় খেই ধরল, 'ঠিক বলেছেন। মাথাটা গিয়ে সোজা পড়েছে চাকার তলায়। আমি স্পষ্ট দেখেছি।'—এক ভদ্রমহিলা ডুকরে উঠলেন, 'উফ্, কি ভয়ানক! মাগো—'

অতশত শোনার মত ধৈর্য ছিল না ভবেশবাবুর। তিনি তখন খোওয়া যাওয়া মালপত্রের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। ভিড়ের ভেতর এর বগলের তলা দিয়ে ওর বুকের পাশ দিয়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে মোটামুটি সব জিনিসই পেয়ে গেলেন তিনি। শুধু চশমা আর হাতঘড়িটা বাদে।

একসময় অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এসে গেল। দুজন ধাঙড় নিচু হয়ে বাসের তলা দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না ভবেশবাবু। ফিক করে হেসে ফেললেন। একটুবাদেই রগড়টা জমে উঠবে। যখন বাসের তলা থেকে ধাঙড়-দুটো খালি হাতে উঠে আসবে। কিন্তু ততক্ষণ আর দাঁড়ালেন না তিনি। তার কাজ হাসিল হয়ে গেছে। অতএব ফের ফুটপাতে উঠে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

খানিকটা এগিয়ে যেতে ভবেশবাবু মুহূর্তে নিভে গেলেন। রেল-কোম্পানীর বড় ঘড়িতে ন'টা বেজে পাঁচ। আধ ঘণ্টার মত তাকে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার আগে কোন গাড়ি নেই। তারপরেই ভাবনাটা অন্য দিকে মোচড় খেল। দুর্ঘটনাটা ঘটেছে সাতটা বেজে পঁচিশ—ছাব্বিশ মিনিটের মাথায়। তারপর এতক্ষণ তো তার রাস্তায় থাকার কথা নয়। তা হলে—

সাউথ স্টেশনে এসে প্ল্যাটফরমে ঢোকার মুখে আরেক প্রস্থ দমে গেলেন ভবেশবাবু। টিকিট কালেক্টর কমল বসু গেটের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। একই পাড়ায় থাকেন তারা। ভবেশবাবু ভেতরে ঢুকবার আগে হেসে বললেন, 'ডিউটি ক'টা অব্দি?'

কমল বসু তার কথার কোন উত্তর কর্‌ল না। এমন কি, সামনে জ্বলজ্যান্ত মানুষটা, তাকে দেখতে পেয়েছে বলেও মনে

হল না ভবেশবাবুর। বরং চাষাড়ে গলায় বলল কমল বস্থ, 'টিকিটগুলো সবাই দেখিয়ে যান।'

হাতে বেশ অনেকটা সময়। ভবেশবাবুকে নামতে হবে সামনের দিকে। এখনো ট্রেন এসে দাঁড়ায় নি প্ল্যাটফরমে। তিনি এগুতে লাগলেন। একসময় কমল বস্থর ওপর তার অভিমানটা পড়ে গেল। চোখে চশমা নেই তার। জামা-কাপড়ে যত রাজ্যের ধুলো, কাদার ছিটে। তাই চট করে ভদ্রলোক হয়ত তাকে চিনতে পারে নি। ভাবলেন ভবেশবাবু।

প্ল্যাটফরমের একেবারে মাথার দিকে চলে গিয়ে কাঠের বেঞ্চে বসে পড়লেন ভদ্রলোক। এতক্ষণ যা উত্তেজনায় কেটেছে। টিউব আলোগুলো জ্বলছে না। যাত্রীর আনাগোনা নেই এধারে। রীতিমত নির্জন জায়গাটা। খানিকবাদেই নতুন এক ভাবনা ছেঁকে ধরল ভবেশবাবুকে। সত্যি, আজ যদি তিনি বাসের চাকায় পিষে গিয়ে অক্কা পেতেন! খবরটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই গোড়খাড়ায় পৌঁছে যেত। কেননা, তার ডেডবডির বুক পকেট হাতড়ালেই ঠিকানা পাওয়া যেত। মান্থলি টিকিটে তার নামধাম সবই লেখা আছে। কিন্তু তারপর! বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল ভবেশবাবুর। দুই ছেলে এক মেয়ে। কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি তিনি। লেখাপড়া জানলে না হয় একে-ওকে ধরেটরে যা'হোক একটা চাকরি জোগাড় করে নিতে পারত শেফালী। কিন্তু ওর বিদ্যের দৌড় যে ক্লাস এইট পর্যন্ত। তার ওপর শ্বশুর বাড়ির অবস্থাও ভাল নয়। যা দিনকাল—

আরে আরে, এ কি! তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভবেশ-বাবু। চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য! কখন যে গাড়িটা এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল, যাত্রীরা ওঠানামা করল, আবার ছেড়েও দিল—কিছুই তিনি টের পেলেন না! যা বাব্বা। ভবেশবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালেন। ট্রেনটা তখনও প্ল্যাটফরম ছাড়ায় নি। দারুন জোরে দৌড়ে প্রায় পাঁচ ছ' হাত লঙ জাম্প কেটে ভিড়ঠাসা

ট্রেনের শেষ কামরায় ঠিক উঠে পড়লেন তিনি। তারপর সুট্ করে ভেতরেও ঢুকে গেলেন অনায়াসে।

সোনারপুরে টিপটিপে বৃষ্টি হচ্ছিল। লেভেল ক্রশিং ছাড়িয়ে পুবে কোণাকুণি পাকা রাস্তা। রাস্তার ধারের দোকানগুলোর বেশীর ভাগই ঝাঁপ বন্ধ। তার ভেতর দিয়ে সরু পথ। সেই পথ ধরে বাজারের ভেতর দিয়ে পেছনের দিকে চলে এলেন ভবেশ-বাবু। তারপর একসময় কানাই'র পানবিড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভবেশবাবু সকাল-সন্ধ্যা এখান থেকে সিগারেট কেনেন। বললেন, 'কই হে কানাই, ঝটপট এক প্যাকেট চার-মিনার দাও তো।'

কানাই খুচরো পয়সা গুণছিল। মুখ তুলে একবার দুই ভুরু জোড়া করে তাকাল সামনের দিকে। তারপর ফের পয়সা গুণতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিরক্ত ভবেশবাবু গলা চড়ালেন, 'কি হল, সিগারেট দেবে না!'

কানাই নির্বিকার। ভবেশবাবু রেগেমেগে দুটো কটু কথা বলতে যাবেন এমন সময় ঝট্ করে আলো নিভে গেল। লোডশেডিং—

আকাশ অন্ধকার, মেঘে ঢাকা। খোওয়া-ওঠা জলকাদায় প্যাচপেচে রাস্তা। যে কোনো সময়ে পা হড়কে পড়ে যাবার ভয়। দুদিকে নিরেট অন্ধকার। ঘরবাড়ি পুকুর মাঠ সব যেন এক হয়ে গেছে। তবু হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না ভবেশবাবুর। বরং, রাত হয়ে গেছে, ছেলেটার জ্বর, বেশ বড় বড় পা ফেলেই তিনি এগুচ্ছিলেন। তাছাড়া ভূতুড়ে আবছায়ায়, মজার ব্যাপার, ভবেশ-বাবু যেন নিশাচর প্রাণীর মত সব কিছুই মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। মনে মনে হাসলেন তিনি। অবাক হবারই কথা। তাহলে কি চোখে চশমা নেই বলেই তিনি সব ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পারছেন। কে জানে।

বুড়ো শিবতলার মোড়ে এসে ডাইনের রাস্তায় শর্টকাটে বাড়ি পোঁছনো যায়। কিন্তু সেদিকে এগুলেন না ভবেশবাবু। একে

কাঁচা রাস্তা। তার ওপর কিছুটা পথ হাঁটুজল ভাঙতে হয়। তাছাড়া ওধারে সাপখোপেরও ভয় আছে।

বাঁদিকের রাস্তা ধরে কয়েক পা এগুতেই সামনে পড়ল এক ভীষণ বাধা। কোত্থেকে গোটা তিনচার কালো মিশমিশে কুকুর হঠাৎ তার দিকে বিশ্রি শব্দ করে ছুটে এল। উটকো ঝামেলা। ভয়ে ভবেশবাবু পেছুতে লাগলেন। আর সেইসঙ্গে ধমক, 'কি আপদ! যাঃ যাঃ—'

প্রতিদিন এপথে যাতায়াত করেন ভবেশবাবু। কিন্তু এই ধরনের বিপদে এর আগে কখনও পড়েন নি তিনি। মাঝেমধ্যে রাস্তায় দু' একটা কুকুর যে তার চোখে পড়ে নি তা নয়; কিন্তু সেগুলো এরকম তাগড়াই নয়, নেহাৎ নেড়ী আর নিরীহ।

কুকুরগুলো তাড়া করে ভবেশবাবুকে শিবমন্দিরের পেছন দিকে নিয়ে গেল। এর মধ্যে একটা আবার তার কাপড়ের খুঁট কামড়ে ধরেছিল। টানাহ্যাঁচড়ায় কাপড়ের খানিকটা অংশ ছিঁড়েও গেছে। কিন্তু আর কোথায় পেছুবেন তিনি। ওধারে যে ঘন বাঁশঝাড়। অগত্যা, প্রাণের দায় বড় দায়, একলাফে চাতালে উঠে ইটের খাঁজ ধরে ধরে শেষ পর্যন্ত তিনি ভাঙাচোরা মন্দিরটার মাথায় উঠে গেলেন। বিপদ আর কাকে বলে। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন। বেশ রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া কাছাকাছি কোন ঘরবাড়িও নেই যে চেঁচালে কেউ ছুটে আসবে।

আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। নাছোড়বান্দা কুকুরগুলো চাতালে উঠে এক নাগাড়ে চিৎকার করছে। এদিকে বৃষ্টির ফোঁটাও ক্রমশ বড় হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা। শেষ পর্যন্ত একটা ফন্দী বের করে ফেললেন ভাবশবাবু। কথায় আছে, বিপদে বুদ্ধি খেলে। মন্দিরের ওপরে বটগাছের ডালপালা নেমে এসেছে। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে মাঝারি সাইজের একটা ডাল ভেঙে ফেললেন। তারপর সেটাকে সজোরে ছুড়ে মারলেন রাস্তার মোড়ের দিকে। সুফল পাওয়া গেল। ঝুপ করে একটা শব্দ। কুকুরগুলো সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের চাতাল থেকে লাফ মেরে সেদিকে দৌড় লাগাল। এই সুযোগ। আর একমুহূর্তও অপব্যয় করলেন না ভবেশবাবু।

মন্দিরের মাথা থেকে বলতে গেলে লাফিয়ে নেমে এলেন তিনি। তারপর দে ছুট্।

কুকুরগুলো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা কি হল বোঝবার জন্য তাকাচ্ছে চারদিকে। এদিকে প্রাণপণে কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটে চলেছেন ভবেশবাবু। কাদা, গর্ত, পিছল পথ—কোন ভ্রূক্ষেপ নাই তার। কিছুটা এগুতো আবার আরেক বিপদ। ভবেশবাবু দেখলেন—সামনের দিকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে এক জায়গায় হঠাৎ জলে ডুবে গেছে। ব্যাপার কি! পাশে রায়েদের বিরাট পুকুর। দীঘিও বলা যায়। ভদ্রলোক বুঝলেন, বৃষ্টিতে পুকুরের পাড় ভেঙে ডুবে গেছে জলে। বেশ অনেকটা জায়গা। আর বুঝি বাঁচা গেল না। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন ভবেশবাবু। যমদূতের মত কুকুরগুলো ক্রমশ ঘেউ ঘেউ শব্দে এগিয়ে আসছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলবে। 'জয় মা' বলে তিনি সামনের দিকে লাফ মারলেন।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ভবেশবাবু। অন্তত পনের যোল ফুট তো হবেই। ছেলেবেলায় সেই কবে স্কুলের স্পোর্টসে দৌড়ঝাঁপ করেছেন তিনি। আজ তার কি হল। যেন কেউ তার দু'পায়ে ঘোড়ার খুর বেঁধে দিয়েছে। অক্ষত দেহে তিনি গিয়ে ঠিক জল ছাড়িয়ে পড়লেন রাস্তার ওধারে। আরো আশ্চর্যের কথা, তার দু'হাতের মালবোঝাই ব্যাগ দুটোও হাতেই রয়েছে। কোন জিনিসই পড়ে যায় নি ছিটকে।

ওদিকে কুকুরগুলো সমানে চেঁচাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালেন ভবেশবাবু। কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন একটু। তারপর ঘুরে উল্টোমুখো বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

ভট্টাচার্যপাড়ার একেবারে শেষের বাড়িটা ভবেশবাবুর। বাড়ির সামনের দিকে দুধারে কলাগাছের ঝাড়। মাঝখানে কাঠের গেট। ভেতরে ঢুকতে প্রথমে উঠোন। এককোণে কুয়ো। পাশে রান্নাঘর, ঘর।

দূর থেকে কলাঝাড়ের জাফরির ভেতর দিয়ে ভবেশবাবু দেখতে

পেলেন—উঠোনে অনেকগুলো হ্যারিকেন। সেই সঙ্গে চাপা কথাবার্তা। ফিসফাস শব্দ। কি ব্যাপার! দাঁড়িয়ে পড়বেন ভেবেও ভদ্রলোক জোরে পা চালালেন। কাঠের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই টের পেলেন তার অনুমান মিথ্যে নয়। এত রাতে তার বাড়িতে এত লোকজন কেন! সবাই পরিচিত। পাড়ার প্রতিবেশী। তবে কি, কেউ যেন জোরে ঝাঁকাচ্ছিল ভবেশবাবুকে, বুবাইর কিছু হল না তো! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইত। ঘরের ভেতর শেফালী বুকফাটা চিৎকার করছে। তবে কি বুবাই·········। কেউ যেন ধাক্কাতে ধাক্কাতে ভবেশবাবুকে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ভেতরের দৃশ্য আরো মর্মান্তিক। আলুথালু শেফালী দু'হাতে ভর রেখে পাগলের মত মেঝেয় মাথা ঠুকছে আর কেঁদে যাচ্ছে। দুধারে কিছু মহিলা। সকলেই আশপাশের বাড়ির। যদু ভট্টাচার্যের স্ত্রী, বেণু দত্তর মা, অমিয়বাবুর মেয়ে চৈতি······। শেফালীর মাথার দিকে ভোলা আর ঝুমরি। কান্নায় ফোলা ওদের হতচকিত দৃষ্টি। বুবাই কোথায়? তাহলে কি পাশের ঘরে শুয়ে আছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত এর পা ওর হাত মাড়িয়ে মাঝখানের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ভবেশবাবু। কিন্তু একি! দরজার কাছে এসে তিনি যেন এক প্রচণ্ড ঠোক্কর খেলেন। সামনেই তো বুবাই। দেয়ালে পিঠ রেখে মাথা নিচু করে চোখ ডলছে। আর থরথর করে কাঁপছে একটা পলকা গাছের মত।

বেণু দত্তর মার গলা শোনা গেল। যদু ভট্টাচার্যের স্ত্রী আর অমিয়বাবুর মেয়ে চৈতি দু'হাত দিয়ে টেনে বসাতে চাইছে শেফালীকে। বেণু দত্তর মা শেফালীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলে যাচ্ছেন, 'এসময় তোমার এমন পাগলামি করলে কি চলে! অন্তত ছেলেমেয়েগুলোর মুখের দিকে চেয়ে বুক বাঁধতে হবে তো বউমা। নইলে, মানুষটা দিব্যি স্নান-খাওয়া করে অফিসে গেল আর ফেরার সময় বাসের তলায়, অদৃষ্ট আর কাকে বলে!'

ভবেশবাবু আর দাঁড়ালেন না। ধাঁ করে পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। এ ঘর দিয়ে বেরুবার মত কোন দরজা নেই। ভবেশবাবু

সুড়ুৎ করে জানলা দিয়ে গলে পেছনের বেলগাছটার মগডালে উঠে গেলেন।

বাড়ির ভেতরে বাইরে ধীরে ধীরে লোকজনের ভিড় আর কথাবার্তার আওয়াজ বাড়ছে। কিন্তু সেদিকে মন দেবার মত সময় নেই ভবেশবাবুর। তিনি যে এখন নিজেকে নিয়েই ভীষণ ব্যস্ত। হাতের ব্যাগ দুটো কখন যে রাস্তায় পড়ে গেছে খেয়াল নাই তার। ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাইনের টাকাটা বের করতে গিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। টাকা তো দূরের কথা জামাটাই যে নেই তার গায়ে। তবু হাতটা আরো ভেতরের দিকে চালিয়ে দিলেন। একি, একি! ভোজবাজি নাকি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ভবেশবাবু নিজের বুক, পেট, পা, হাত, মাথা কোন কিছুরই হদিশ পেলেন না।

তখনো নিচে ঘরের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শেফালী কাঁদছিল একটানা।



অদ্ভুতুড়ে

তখনো গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হতে দিনকয়েক বাকি। এমন সময় ন'কড়ি মামার চিঠি এল কলকাতা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এবার ওরা দলে আরো ভারি। টুকাই ক্লাশ ওয়ানে উঠেছে। সুতরাং ও-ও যাবে সঙ্গে।

ভাইবোন মিলিয়ে এবার টুরিস্টের সংখ্যা পাঁচ। পিংকু, মামন, রাণা, মৌ আর টুকাই। দাবীদার অবশ্য আরো একজন ছিল। সে বাবুয়া। দাদাদিদিদের সঙ্গে সেও ভিড়ে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল আধো আধো গলায় 'আমিও যাব।'—বলা বাহুল্য শেষপর্যন্ত সে টীম থেকে বাদ পড়েছে একাধিক কারণে। প্রথমত, তার বয়েস মাত্র দুই। দ্বিতীয়ত, এখনো মায়ের বুকের দুধ না খেলে তার রাতে ঘুম আসে না।

ন'কড়ি মামা ওদের নিকট আত্মীয় নন। বড়মার লতাপাতায় সম্পর্কে কি রকম যেন ভাই। সে যাই হোক, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ওপর মামা মামীর খুব টান। ন'কড়ি মামা দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের পুরনো আমলের বাসিন্দা। পৈতৃক বাড়ি, দোতলা। উপর-নিচ মিলিয়ে বড় বড় আটখানা ঘর। সবই ন'কড়ি মামার দখলে। স্বাভাবিক। তার আর কোন ভাইবোন নেই। উপরন্তু, কস্মিনকালে তিনি চাকরি-বাকরি করেন নি। অর্থাৎ করার দরকার হয় নি। তার বাবা ছিলেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডাকসাইটে অফিসার। তিনি চোখ বোজার আগে ছেলের জন্য ব্যাঙ্কে যা রেখে গিয়েছিলেন তা ফুঁকে দেওয়া ন'কড়ি মামার এক জীবনের কম্ম নয়। দেখতে দেখতে মামা কেমন আনন্দে যাটটা বছর পার করে দিলেন। কাজের মধ্যে শুধু দামী সিগারেট খাওয়া আর জামাকাপড়ে টিপটপ হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো। যেমন খোলামেলা তেমনি তিনি আমুদে আর ফুর্তিবাজ। বয়সের বাছবিচার নেই। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারেন।

নকড়িমামার বউ মামীমা এককালে দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। লাল টুকটুকে গায়ের রঙ। কয়েকবছর হল ভারিসারি হয়ে গেছেন। স্বভাবে একেবারে ন'কড়িমামার বিপরীত। লোকজন হই-হট্টগোল তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। দারুণ শুচি-বায়ুগ্রস্ত। সব সময় একটা না একটা কাজ নিয়ে আছেন। বাড়িতে দাসদাসীর সংখ্যা চার। সকলে তার ভয়ে তটস্থ। এমন কি ন'কড়ি-মামাও। কোন ঘরের মেঝেয় একটু কুটো পড়ল কি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তোলেন। সকাল-সন্ধ্যা কম করে সাত আটবার ঘরদোর বারান্দা সিঁড়ি ঝাঁটপাট হওয়া চাই। কোন জিনিস ঠিক জায়গা থেকে নড়লে আর রক্ষে নেই। শেষরাতে উঠে গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকুর ঘরে ঢোকেন। সেখান থেকে বেরুতে বেলা দশটা। খাওয়ার সময় কেউ তার ত্রিসীমানা মাড়ায় না। এহেন জবরদস্ত মামীমা একটা ব্যাপারে কিন্তু অত্যন্ত কোমলপ্রাণা। ছেলেপুলে নেই বলেই হয়ত এটা হয়েছে। বছরে অন্তত একবার করে পিংকু-মামন-রাণা-মৌ ওরা না এলে তিনি কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। গ্রীষ্মের ছুটি পড়বার আগেই তাড়া লাগান। বলেন ন'কড়ি মামাকে, 'আর গড়িমসি করো না। এবার চিঠি লেখো শুভেন্দুকে। ছেলেপুলেগুলোকে যেন ছুটি পড়তেই পাঠিয়ে দেয় এখানে।' —সেই সঙ্গে মামীমার কাজের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মামন আর মৌ'র জন্য বয়েম ভরে নানাধরণের আচার করেন। আর পিংকু-রাণার জন্য বেলের মোরব্বা, ঝুরো নিমকি, চানাচুর ইত্যাদি। যা যা ওদের প্রিয় খাদ্য সেইসব। ওরা এসে পড়লে মামীমা ক'দিন অন্য মানুষ। থমথমে মুখ হাসিতে ভরে যায়। ওরা হুড়োহুড়ি করে। বাড়ির সব জিনিস ছত্রাখান করে ফেলে। মামীমা কিন্তু হাসিমুখে ওদের সব দৌরাত্ম্য সহ্য করেন।

ওদিকে ভাগ্নেভাগ্নীরাও সারা বছর উৎসুক হয়ে থাকে। কবে গ্রীষ্মের ছুটি হবে সেই আশায় দিন গোণে। ওরা থাকে বাঁকুড়ায়, ফিডার রোডে। পিংকুর বাবা অর্ধেন্দুবাবু উকিল। মামনের বাবা শুভেন্দু কলেজের মাষ্টার। ক'টা দিন ন'কড়িমামার বাড়িতে ওদের কি

আনন্দেই যে কাটে। বকাঝকার কেউ নেই। সবাই যেন খাঁচাছাড়া পাখির মত মুক্ত। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সিনেমা এসব দেখা তো আছেই। এছাড়া ফুচকা, মোগলাই পরোটা, কষা মাংস, ধোসা—পৃথিবীর যাবতীয় রসনা পরিতৃপ্তিকর খাদ্য অকাতরে ওদের খাওয়ান ন'কড়িমামা।

এবার কিন্তু ওদের কলকাতা-ভ্রমণ একেবারে মাঠে মারা গেল। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে পা দিতেই শুরু হল বৃষ্টি। দিন নেই রাত নেই ঝরছে তো ঝরছেই। সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। খবরের কাগজের ভাষ্য অনুযায়ী কলকাতায় মে মাসে এরকম বৃষ্টি নাকি গত পঞ্চাশ বছরে আর কখনো হয়নি। বেরুবার কি জো আছে। রাস্তাঘাট জলে থই থই। তার ওপর প্রতিদিন শহরের আনাচে-কানাচে দু'একজন করে বজ্রপাতে মারা যাওয়ার ঘটনা তো লেগেই আছে। ফলে ঘর-বন্দী সকলেই বেজায় মনমরা। বিশেষ করে পিংকু আর মামন। পিংকুর ইচ্ছে ছিল এবার ন'কড়ি মামার সঙ্গে কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলা দেখতে যাবে। আর মামনের খুব শখ মামীমাকে নিয়ে বসুশ্রীতে গিয়ে 'জয় বাবা তারকনাথ' দেখবে।

সব গুড়ে বালি। দেখতে দেখতে চলে যাবার দিন এসে গেল। দুপুরের বাসে শুভেন্দু আসবে। রাতের ট্রেনেই ভোরবেলা। আবার ফিরে যাবে বাঁকুড়ায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে। বাইরের ঘরে ওদের নিয়ে বসে আছেন ন'কড়িমামা। সকলেরই মন মেজাজ খারাপ। মামীমা একবার এসে বলে গেলেন, 'কি খাবি আজ তোরা? আবার তো বৃষ্টি আসছে। রঘুকে বাজারে পাঠিয়েছি ইলিশ মাছ আনতে। ভাবছি খিচুড়ি করব।'

রাণা ক্লাশ ফোরে উঠেছে। এখন সুযোগ পেলেই দু'একটা ইংরেজী শব্দ বলে ফেলে। তাছাড়া ও ভোজনরসিকও বটে। বলল সোৎসাহে, 'খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। ফাইন হবে মামীমা।'

—মামীমা কিন্তু খুব খুশি। বৃষ্টিবাদলার দৌলতে একদিন ছেলেমেয়ে-গুলোকে খুব কাছে পেয়েছেন, তাই।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। মতির মা এসে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে মামন বলল, 'একটা গল্প বলো মামা।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা নেড়ে সায় জানাল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো মামা।'

পিংকু এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। অঙ্কে ভাল। বলল, বিজ্ঞের মত, 'বিজ্ঞান-বিষয়ক একটা গল্প—'

সঙ্গে সঙ্গে মামন বেণী ঝাঁকাল, 'দূর, বিজ্ঞান-ফিজ্ঞান নিয়ে নয়—'

'তাহলে?'—মুচকি হাসলেন ন'কড়িমামা। বোঝা গেল, আজ তিনি গল্প বলতে রীতিমত আগ্রহী।

'শিকারের গল্প জানো কিছু?'—মামন প্রশ্ন করল।

'কেন জানব না, নড়েচড়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরালেন নকড়িমামা, 'একবার তো লরেন্স সাহেবের সঙ্গে হাজারিবাগের জঙ্গলে বাঘ মারতে গিয়েছিলাম নাইটিন ফরটি থ্রি'র কথা—'

আপত্তি তুলল টুকাই। বলল, 'না শিকার নয়, ভূতের গল্প বলো মামা।'

টুকাইর কথায় গলা মেলাল রাণা। বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা-ই হোক্।'

'ভূত'!—চোখ বুজে কিছু একটা ভাবতে চাইলেন ন'কড়িমামা। তারপর একসময় বলে উঠলেন, 'কপালে না থাকলে কি আর ভূতের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়। তবে হ্যাঁ, চাক্ষুষ না দেখলেও এমন একটা ঘটনার কথা জানি—'

'সত্যি ঘটনা?'—মামনের চোখ বড় হয়ে উঠল।

'শুধু সত্যি নয়, একেবারে মর্মান্তিক সত্যি—', এই পর্যন্ত বলে ন'কড়িমামা ফের চোখ বুজে যেন ঘটনাটাকে ভেতর থেকে টেনে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঘরের ভেতরটা ক্রমশ আবছা হয়ে উঠছে। বাইরে বৃষ্টি আর বাতাসের ফোঁসফোঁসানি। ভূতের গল্প শোনার মতই পরিবেশ।

'বুঝলি, সে বড় দুঃখের কথা।'—বড় একটা হাই চাপতে গিয়ে ন'কড়িমামার বুক কেঁপে উঠল।

'কি রকম?'—প্রশ্ন করল পিংকু। ততক্ষণে মামন, রাণা, মৌ, টুকাই এগিয়ে এসে ন'কড়িমামার গা ঘেঁসে বসেছে।

সিগারেটের পোড়া অংশটুকু অ্যাশট্রের গর্তে গলিয়ে দিয়ে বলে চল্লেন ন'কড়িমামা—

"আমার এক খুড়তুতো ভাই, থাকত কাত্রাসগড়ে। নাম সুকুমার। হঠাৎ সে বহু বছর বাদে এক সন্ধ্যায় এবাড়িতে এসে হাজির। যথারীতি আপ্যায়ন করে বললাম, 'তারপর, এ্যাদ্দিন বাদে, হঠাৎ কি মনে করে?'

মুখ কাচুমাচু করে সুকুমার বলল, 'দারুণ এক বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি দাদা।'

তোদের মামীমা তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আড়ি পেতে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। শুধোলাম, 'বিপদ, মানে?'

সুকুমার বলল, 'পনের বছর কাত্রাসগড়ে কাজ করার পর হঠাৎ দশদিনের নোটিশে আমাকে হাওড়ায় বদ্‌লি করেছে। আসছে মাসের পয়লাই আমাকে এখানে জয়েন করতে হবে।'

হেসে ফেললাম, 'এতে বিপদটা কি হল। সবাই তো কলকাতাতেই আসতে চায়।'

'না—না, সে কথা বলছি না আমি,' সুকুমার বলল, 'আসলে কি জানো দাদা, হঠাৎ করে এখন আমি বউ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় উঠি। কলকাতায় এমন কেউ জানা নেই যে—। তাছাড়া, এ ক'দিনের ভেতরে চট করে কোথায় বা বাড়ি পাব আমি। আর তুমি তো জানো, রেলের চাকরি, তেমন কিছু একটা মাইনে পাই না যে বেশি ভাড়ার বাড়িতে উঠব।'

আমি চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর ছেলেমেয়ে কটি?'

সুকুমার জবাব দিল, 'দুই মেয়ে এক ছেলে।'

'তাহলে তো তোর কম করে দুটো ঘরের দরকার, তাই না?' বললাম।

মাথা নাড়ল সুকুমার।

ওদিকে তখন তোদের মামীমার গলা খাকাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। বুঝলাম—তলব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। ভেতরের ঘরে যেতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চাপা গলায় মামীমা ধমকাল আমাকে। বলল, 'সাবধান, ওসব ভাইফাইকে এসো-বোসো করে এ বাড়িতে ঢোকানো চলবে না। তাহ'লে, তোমার একদিন কি আমার একদিন—'

মুখ কালো করে এ ঘরে চলে এলাম। বললাম, 'সত্যি, খুব ঝামেলায় পড়েছিস দেখছি। তবে আমার কথা যদি শুনিস তবে বলি কি—

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো দাদা?'—কৌতূহলী চোখে সুকুমার তাকাল আমার দিকে।

'আমার মনে হয়,' বিজ্ঞের মত বললাম, আপাতত বরং তুই একটা হোস্টেল দেখে কলকাতায় চলে আয় একলা। তারপর ঘরটর দেখে নিয়ে ধীরে-সুস্থে ওদের নিয়ে আসিস্।'

'কিন্তু কাত্রাসগড়ে ওদের রাখব কোথায়?' হতাশ সুরে বলল সুকুমার, 'সামনের মাসের পয়লাই যে কোয়াটার ছাড়তে হবে।'

আমি তখন ওকে হটাবার সূত্র পেয়ে গেছি। বললাম, 'এটা কিন্তু তুই ঠিক বললি না। ওখানকার অফিসের বড়কর্তাকে ধরলে বদলির পরেও অন্তত তিনমাস কোয়াটারে থাকা যায়। একবার সেই চেষ্টাই করে ছাখ্ না।'

প্রস্তাবটা সুকুমারের খুব ভাল লাগল বলে মনে হল না। ও গুম্ মেরে গেল।

সান্ত্বনার সুরে বললাম ফের, 'মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস কিন্তু। আমিও দেখছি, এধারে যদি ঘরটর পাওয়া যায়—

সুকুমার আর কোন কথা না বলে কালো মুখে বেরিয়ে গেল।

"পিংকু ফস করে বলে উঠল, 'ধ্যুৎ, ভূতের গল্প কোথায়। এতো দেখছি—'

টুকাই কলকল করে উঠল, 'তুই থামবি দাদা। কেবল কথার মধ্যে ফোড়ন কাটা। যত বদ্ অভ্যাস।'

টুকাই আজকাল কথাবার্তায় ওর মার ভঙ্গি নকল করতে শিখেছে। তাছাড়া ভূতের গল্প শোনায় ওর দারুণ আগ্রহ।

ঘরের ভেতরটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠছে। মামন উঠে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে এল।

রহস্য করে হাসলেন ন'কড়িমামা। বললেন, 'অত উতলা হলে কি চলে পিংকু—'

ভিরকুটি কাটল টুকাই, 'দাদার কথা ছাড়ো। তুমি বলে যাও তো মামা।'

ফের একটা সিগারেট ধরালেন ন'কড়িমামা। নড়েচড়ে বসে তাকিয়াটা কোলে টেনে নিলেন। তারপর সিগারেটে জোরে একটা টান মেরে ফের বলতে লাগলেন—

"এর দিন চারপাঁচ বাদেই এক রবিবার সকালবেলা মুখ হাসি হাসি করে সুকুমার এসে হাজির।"

আমি বললাম, 'তারপর কি, খবর বল্?'

'খবর ভাল দাদা,' সুকুমার বলল, 'বাড়ি পেয়ে গেছি একটা। শ্যামবাজারের দিকে। দোতলায় চারখানা ঘর। বেশ বড় ঘর। ভাড়াও নাম মাত্র। মোটে পঞ্চাশ টাকা।'

'বলিস কি!'—আমি হাঁ হয়ে গেলাম। কলকাতা শহরে চারখানা ঘর পঞ্চাশ টাকায়!

সুকুমার লটারীর টিকিট পেলেও এর চেয়ে বেশী অবাক হতাম না আমি।

'হ্যাঁ', হাসতে গিয়েও মাঝপথে থমকে গেল সুকুমার, 'তবে—'

'তবে কি?'—আমি ঝুঁকে ধারাল গলায় প্রশ্ন করলাম।

'না, মানে—', ঢোঁক গিলে বলল সুকুমার, 'আশপাশের লোকেরা বলছে ও বাড়িতে নাকি ভূত আছে। তাই ভাড়া হয় না।'

বিংশশতাব্দীতে ভূত! তাও আবার কলকাতা শহরে? রহস্যের গন্ধ পেলাম। বললাম, 'ব্যাপারটা কি খুলে বল্ না।'

সুকুমার যা বলল তা রীতিমত এক নাটুকে গপ্পো। বাড়িটা নাকি এক জমিদারের। দোতলা হলে কি হবে চকমিলান। সামনে মস্ত ফুলের বাগান। মাঝেমাঝে পাথরের স্ট্যাচু, ফোয়ারা। গোটা বাড়ির মেঝে শ্বেত পাথরে বাঁধানো। বড় বড় জানালা। তাতে রঙিন কাচ বসানো। জমিদার ছিলেন ভয়ঙ্কর বদমেজাজী আর উচ্ছৃংখল ধরনের। তার ছিল এক সুন্দরী স্ত্রী। যেমন দেখতে তেমনি গানে ছিল অপূর্ব গলা। জমিদার নাকি স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। শেষে একদিন দেখা গেল স্ত্রী নিখোঁজ। পাড়ার বুড়োরা বলে—বেটা জমিদার স্ত্রীকে দোতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। তাতে স্ত্রী মারা যায়। ঘটনাটা ঘটে এক পূর্ণিমার রাত্রে। তারপর স্ত্রীর লাশ নাকি সেই রাতেই জমিদার বাড়ির ভেতর কোথাও পুঁতে দেয়। সেই থেকে প্রায়ই রাতে ও-বাড়িতে এক নারীর কান্না, আর্তনাদ ইত্যাদি শোনা যায়। যার জন্য আজ পঁচিশ তিরিশ বছর হতে চলল বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। কেউ ভাড়া নিতে সাহস করে না।

'দারুণ ইনটারেস্টিং কাহিনী তো', আমি বললাম, 'এখন একতলায় কে থাকে ?'

'এক বুড়ি।'—সুকুমার বলল।

'তা এখন বাড়িটা ভাড়া দিচ্ছে কে ?'

'জমিদারের নাতি। আহেরীটোলায় থাকে।'

সব শুনে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'এক-সময় তুই নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিলি না সুকুমার ! এক জমিদার স্ত্রীর পেত্নীর ভয়ে এমন একটা ভাল বাড়ি হাতছাড়া করবি ?'

আমার কথায় যেন ভরসা পেল সুকুমার। বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। তা'হলে আজই গিয়ে ভাড়াটা এ্যাডভান্স দিয়ে আসি, কি বলো ?'

'আলবৎ। এ সুযোগ নষ্ট করতে আছে।'—জোরের সঙ্গে বললাম।

তোদের মামীমা সেদিনও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ

তার গলা শোনা গেল, 'কই মতির মা, চটপট সামনের ঘরে চা আর ডিমভাজা দিয়ে এসো তো।'

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আমি খানিকটা ভড়কে গিয়েছিলাম সেদিন। ভূতটুতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এত সস্তায় শ্যামবাজারে বাড়ি, একটু গোলমেলে ঠেকেছিল বৈকি। ও চলে যাবার আগে বললাম, 'তবে একটা কথা। আসছে মাসেই কিন্তু বউ বাচ্চাদের কাত্রাসগড় থেকে নিয়ে আসিস না। একটা মাস বাড়িটায় তুই একলা থাক্। ছাখ্ কি পরিস্থিতি। তারপর বুঝেশুনে ওদের নিয়ে আসবি।'

'আচ্ছা।' বলে সুকুমার রাস্তায় নামল।

কাহিনীটা সবে জমে উঠছে। এমন সময় মামীমার আবির্ভাব। পেছনে বড় একটা ট্রে হাতে মতির মা। ট্রেতে রাশীকৃত তেলেভাজা, বেগুনি, আলুর চপ, পকোরা ইত্যাদি।

ছেলেমেয়েরা সেদিকে তাকিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'থ্রি চীয়ার্স ফর মামীমা। হিপ—হিপ হুর্—রে!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রে ফাঁকা হয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টির তোড় খানিকটা কমে এলেও বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে।

ন'কড়িমামা ফের শুরু করলেন—

"পরের মাসের পাঁচ কি ছয় তারিখ। হঠাৎ আবার সুকুমারের উদয় হল। দু-চোখ জবাফুলের মত লাল। উস্কখুস্ক চুল। গায়ের রঙ ওর টকটকে ফরসা। সেদিন দেখে মনে হল, কেউ যেন ওর মুখে একপোচ ভুসো কালি মেখে দিয়েছে। চেহারাও অর্ধেক হয়ে গেছে।

আমি শুধোলাম, 'কি ব্যাপার?'

সুকুমার কাঁদো কাঁদো মুখে উত্তর করল, 'আর বলো না দাদা। ও বাড়ি আমাকে ছাড়তে হচ্ছে।'

'কেন?'

'কোন মানুষের পক্ষে ওবাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।'

'আহা কি হয়েছে খুলে বল্‌বি তো!'—আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম।

সুকুমার থেমে থেমে ঘটনাটা বলল। প্রথম রাতটা ও বাড়িতে ওর ভালভাবেই কাটে। দ্বিতীয় রাত থেকে উপদ্রব শুরু হয়ে যায়। দোতলার মাঝের ঘরটায় সুকুমার ঘুমোয়। সবে ওর তন্দ্রা মতন এসেছে। এমন সময় ঝুম-ঝুম একটা মিষ্টি আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা এক-তলা থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসছে। সুকুমার যে ঘরে শোয় তার সামনে বড় ঝুলবারান্দা। ঝুলবারান্দার ওধারে বাঁধানো চাতাল। তারপরে বাগান। নূপুরের শব্দটা তার ঘরের সামনেই ঝুলবারান্দায় এসে থেমে গেল। কৌতূহল চাপতে না পেরে সুকুমার উঠে বসল। কাচের জানালা। ঝুলবারান্দার দিকে তাকাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল সুকুমারের। ওখানে দাঁড়িয়ে এক নারী মূর্তি। সারা গা ভরে গয়না। পরনে দামী ঝলমলে শাড়ি। শুক্লপক্ষ। অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় সুকুমার স্পষ্ট দেখতে পেল জমিদারস্ত্রীর পেত্নীকে। পেত্নী বেশ খানিকক্ষণ এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুকুমারের দিকে। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগল। তারপর ইশারা করে ডাকতে লাগল। এদিকে ঘরের ভেতর তো তখন সুকুমার ভয়ে জমে পাথর হয়ে আছে। শেষে একসময় ঝুলবারান্দার রেলিঙে উঠে পেত্নী চাতালের দিকে মারল লাফ। একটু বাদেই সেকি বুক ফাটা আর্তনাদ। এমনি চলছে একই ঘটনা পর পর চার রাত ধরে। এখন এমন অবস্থা সুকুমারের যে রাতের ঘুম তো উঠেই গেছে, তার ওপর পেত্নী ডাকলে আর সে স্থির থাকতে পারে না। দুদিন বাদেই পূর্ণিমা। সেই ভয়ঙ্কর রাত। যেদিন জমিদারের স্ত্রী খুন হয়। এখন কি করবে বুঝে উঠতে না পেরেই ও আমার দ্বারস্থ হয়েছে।

সুকুমারের বলা শেষ হতে না হতেই দরজার ওধারে তোদের মামীমার গলা খাকারির আওয়াজ শোনা গেল। ফের গিন্নীর তলব। বাধ্য হয়ে উঠলাম। ভেতরে যেতেই তোদের মামীমা

চোয়াড়ে গলায় বলল, 'ওসব পেত্নী-ফেত্নীর গপ্পো আমি শুনতে চাই না। তোমার ভাইকে বলে দাও কোন ছুতো করে বউবাচ্চা নিয়ে ওর এ বাড়িতে আসা চলবে না।'

'আহ্, আস্তে কথা বলতে পারো না।'—আমি তোদের মামীমাকে শান্ত করতে চাইলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওর গলা পঞ্চমে উঠল।

'তারপর—', ন'কড়িমামা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়তে না ছাড়তেই হঠাৎ আলো নিভে গিয়ে ঘরটা আবছা মত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টুকাই সুট্ করে ন'কড়িমামার কোলে উঠে বসল।

বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু বাতাসের গর্জন সমানে চলছেই। থেকে থেকে জানালার খড়খড়িগুলো বাতাসের ঝাপটায় কট্ কট্ শব্দে নড়ে উঠতে চমকে চমকে উঠছে রাণা, মৌ—এমন কি বামনও।

'তারপর ?'—ফিসফিসিয়ে বলল পিংকু।

'তারপর আর কি, দুদিন বাদেই পূর্ণিমার রাতে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে পেত্নীকে অনুসরণ করে ঝুলবারান্দা থেকে সুকুমার মারল ঝাঁপ', একটু থামলেন ন'কড়িমামা। তারপর বললেন, 'পরের দিন সকালে এবাড়িতে থানা থেকে পুলিশ এসে হাজির। সুকুমারের ডেড বডি মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে আমাকে।'

বাইরে একটা ট্যাক্সি থামার শব্দ শোনা গেল। টুকাই বলল, 'আমি আগেই ভেবেছিলাম, পেত্নীটা সুকুমারমামার ঘাড় মটকাবে।'

ন'কড়িমামার বাড়ির দক্ষিণে ভেতরে ঢোকার জন্য একটা গেট আছে। সেদিকে টক্-টক্ একটা আওয়াজ শোনা গেল। কেউ কড়া নাড়ছিল বোধহয়। ন'কড়িমামা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'বুঝলি পিংকু, আমিই সুকুমারের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমি যদি সেদিন তোদের মামীমার কথা কানে না তুলে সুকুমারকে বউবাচ্চা নিয়ে এখানে আসতে বলতাম ! তা'হলে ছেলেটা আর বেঘোরে—

ন'কড়িমামার কথা শেষ হল না। ভেতরের ঘর থেকে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মামীমা আবির্ভূতা হলেন। মামীমার এ মূর্তি ছেলেমেয়েরা এর আগে কখনো দেখে নি। বাসনভাঙা গলায় তিনি বলে চললেন, 'ছাখো গিয়ে, তোমার গুণধর ভাই স্বকুমার বউ আর ছানাপোনা নিয়ে সটান হাওড়া স্টেশন থেকে এখানে এসে হাজির। ভাল বলছি, এক্ষুনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো। নইলে হেস্তনেস্ত কাণ্ড করে ছাড়ব কিন্তু—'

'অ্যাঃ,' এক ঝটকায় টুকাইকে কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তড়াক করে চৌকি থেকে ন'কড়িমামা লাফিয়ে নেমে পড়লেন। তার-পর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ব্যাপারটা বুঝতে দেবার আগেই ছুটে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন স্বড়ুং করে।



ভয়ঙ্কর ভ্রমণ

একটা বড়সড় টিলার ধার ঘেঁষে এক পাথুরে রাস্তায় এসে পড়তে বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। বুঝলাম, দিকভুল করেছি।

বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে এরকম অজস্র টিলা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখান থেকে, উত্তর-পশ্চিমে এগুতে থাকলে সুদীপ্তর মুখে শুনেছি, ক্রমশ টিলাগুলি নাকি সংখ্যায় ও উচ্চতায় বেড়ে যেতে যেতে এক সময় বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সীমান্ত এলাকায় ঝিলিমিলি পাহাড়ের রেঞ্জে গিয়ে মিশে গেছে। ওদিকটায় এখনো আমার যাওয়া হয় নি। সুদীপ্ত আশ্বাস দিয়েছে, ওর বিকল জিপটা বাঁকুড়া শহর থেকে সারাই হয়ে ফিরে এলেই একদিন ভোর ভোর আমাকে নিয়ে ঝিলিমিলি ঘুরে আসবে। শুধু পাহাড় নয় ঝিলিমিলির জঙ্গলও নাকি রীতিমত রোমাঞ্চকর। বিশেষ করে এই শীতের মরশুমে। যখন হাতি আর ভালুকের আনাগোনা বাড়ে।

সুদীপ্ত আমার বাল্যবন্ধু। শিবপুর থেকে পাশ করেই সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে। পি. ডব্লু. ডি. ইঞ্জিনীয়ার। আগে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। পাঁচবছরের মত। সাত আট মাস হল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। এখানে মানে রাইপুরে। রাইপুর বাঁকুড়া শহর থেকে মাইল পঁয়তাল্লিশের মত দক্ষিণে। এখানে আসার পর থেকেই চিঠির পর চিঠি ছেড়ে আমাকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল। সব চিঠির একই বয়ান। শঙ্কর, একবার তুই এখানে চলে আয়। অন্তত দিনসাতেকের জন্য। বেড়াবার পক্ষে জায়গাটা অতুলনীয়।

ঘোরার নামে আমি পাগল। থাকি কলকাতার ঘিঞ্জি গলি অক্রূর দত্ত লেনে। ফলে সুযোগ পেলেই কাঁধে কিডব্যাগ চাপিয়ে আর পকেটে কিছু টাকা গুঁজে আমি বেরিয়ে পড়ি। তবে আমার ভ্রমণের একটা বিশেষত্ব আছে। কোথাও গিয়ে হাতপা গুটিয়ে ঘরবন্দী হয়ে

শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া, যাকে শহুরে লোকেরা বলে বিশ্রাম, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দুঃসাহসিক অভিযান না হোক, নিদেন-পক্ষে, এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে অ্যাডভেঞ্চারের কিছু খোরাক অন্তত আছে। এইজন্য প্রথমদিকে আমি সুদীপ্তর আহ্বানে সাড়া দিই নি। ভেবেছি, ও বিয়েটিয়ে করে নি, থাকে বাঁকুড়ার এক ধ্যাদ্ধেড়ে গণ্ডগ্রামে, একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই হয়ত দিনকতকের জন্য আমার সান্নিধ্য চাইছে। শেষে সুদীপ্তর পত্রাঘাত এত ঘন ঘন হতে লাগল (সপ্তাহে একটা করে) যে বন্ধুত্ব রক্ষার খাতিরেই একদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বাঁকুড়াগামী ট্রেনে চেপে বসলাম।

যতটা ভেবেছিলাম রাইপুরে এসে কিন্তু ততটা আশঙ্কার কারণ ঘটল না। দুর্ভেদ্য বন, দুর্গম পাহাড়, পদে পদে রোমাঞ্চ এসব কিছু না থাকলেও জায়গাটা দিনসাতেকের মত বেড়াবার পক্ষে মন্দ নয়। কাঁসাই নদীর গা ছুঁয়ে সুদীপ্তর কোয়ার্টার। পাশেই চমৎকার বাংলো। একদিক চেকনাই গ্রীলে ঘেরা। দুটো বড় বড় শোবার ঘর, মেঝে সুদৃশ্য টাইলস বসানো, খাটে ডানলোপিলোর গদী, মস্ত ডাইনিং রুম। বাংলোর একটা ঘর সুদীপ্ত আমার জন্য খুলে দিয়েছে। শিয়রের দিকের জানালার ওধারে কাঁসাই নদী, রূপোলী বালিয়াড়ী ছাড়িয়ে জলস্রোত। সারাদিন দেহাতী জোয়ান ছেলেমেয়ে কুলির দল মাথায় করে পাথরের চাঙড় বয়ে এনে নদীর ধারে ফেলছে। পেছনে উঁচুনিচু মাঠ। যেন ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে হঠাৎ দিগন্তে হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মহুয়া আর শাল-শিমূল-পিয়াল গাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। এসবের সঙ্গে সুদীপ্তর আদর যত্ন তো আছেই। রোজ মুরগীর মাংস, টাটকা দুধ, খাঁটি ছানার মিষ্টি…

রাইপুরের আরো একটা আকর্ষণ আছে। তা'হল, জায়গাটা খুব প্রাচীন। এক সময় এ অঞ্চলের আদিবাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এক রক্তাক্ত যুদ্ধে মেতেছিল। ইতিহাসে সেই যুদ্ধ 'চূয়াড় বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। তারও আগে রাইপুর ছিল শিখর রাজাদের রাজধানী। এখনো বাংলো থেকে মাইল দেড়েক দূরে মস্ত দুর্গ বা

পরিত্যক্ত গড় পড়ে আছে। ওখানে সাপ-খোপ আর নাকি ভূতের আস্তানা। এছাড়া আছে 'শিখর সায়র' নামে এক পদ্মদীঘি আর প্রাচীন মহামায়ার মন্দির। মন্দিরের সামনের হাড়িকাঠে আগে নরবলি দেওয়া হত। বর্গীর হাঙ্গামার সময় শিখর রাজপরিবারের লোকজন ওই দীঘিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। রাইপুরের মোটামুটি সবই দেখা হয়ে গেছে। একমাত্র গড় বাদে। ইচ্ছে আছে একদিন একাই গড়টার ভেতর ঢুকে পড়ব। কলকাতার লোক। ভূতটুতের ভয় নেই আমার। বরং কৌতূহল আছে। আর এই শীতে আবার সাপের কি ভয়!

কৃষ্ণপক্ষের রাত। শ্লেটের মত মিশকালো আকাশে লাল হলুদ মেটে নানা রঙের খুদে খুদে তারা জ্বলছে। টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। গজ দেড় দুইয়ের বেশী দূরের পথ তাতে দেখা যায় না। রাত বেশি হয় নি। সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। চারদিকে শুধু উঁচু নিচু জমির ঢেউ। তাও কুয়াশায় অস্পষ্ট। একে শীতকাল। তায় অজ জায়গা। লোকজন তো দূরের কথা, শেয়াল কিংবা একটা রাতপাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

পাথুরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পায়ে ভারি বুট। গায়ে তুলোর গেঞ্জীর ওপরে শার্ট। তার ওপরে সোয়েটার, পুলওভার, কোট। গলায় মাফলার। মাথায় টুপী। ডিসেম্বর মাসে এ অঞ্চলে হাড়ভাঙা শীত পড়ে। এত জোব্বাজাব্বা। তার ওপর হাঁটছি এক নাগাড়ে। সেই বিকেল পাঁচটা থেকে। শরীর আর বইছিল না। নিজের আহম্মকির জন্য মনে মনে নিজেকেই ধমকাতে লাগলাম। গোয়ার্তুমি করে একলা না বেরুলেই ভাল হত। অপরিচিত জায়গা। এসেছি মোটে চারদিন হল। পথঘাট কিছুই চিনি না। বেরুবার সময় সুদীপ্তর আর্দালি রামরতন সাবধান করেছিল, 'বেলা পড়ে আসছে। বেশি দূরে কিন্তু যাবেন না স্যার।'

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন?'

রামরতন বলেছিল, 'রাতের বেলা জায়গাটা ভাল নয়। ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের ভয় তো আছেই, তাছাড়া—।'

আমি ওকে কথা শেষ করতে দিই নি, 'ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ে আমাকে কি করবে। খালি হাতে বেরুচ্ছি। সঙ্গে থাকার মধ্যে আছে একটা পুরনো লজঝড়ে ঘড়ি। এটা নিয়ে গেলে দুঃখ নেই, বরং একটা নতুন কিনবার সুযোগ পাব।'

রামরতন আর বাক্যব্যয় না করে গুম্ মেরে গিয়েছিল।

দুর্গতি আর কাকে বলে। আজ দুপুরের দিকে সুদীপ্ত মুকুটমণিপুরে গেছে। অফিসের জরুরী কাজে। একা বাংলোয় বসে সময় কাটছিল না। বাংলোর গা ঘেঁসে ব্রীজ অ্যাপ্রোচ। মানে উঁচু রাস্তা। যেটা ব্রীজের দিকে গেছে। রাস্তার ওধারে রাইপুর। গ্রাম হলেও বেশ বর্ধিষ্ণু। থানা হাটবাজার স্কুল সবই আছে। সেদিকে গেলে ঝামেলায় পড়তাম না। আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে রওনা হয়েছিলাম তার উল্টোদিকে। যে দিকে লোকালয় নেই। ফাঁকায় তারিয়ে তারিয়ে সূর্যাস্ত দেখব এই আশায়। তারপর সূর্য ডুবে গেলে হাঁটছি তো হাঁটছিই। রাইপুর দূরের কথা, এতক্ষণে কোন লোকালয় চোখে পড়ল না।

হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। বুঝলাম, এভাবে দিশেহারার মত রাতভোর হাঁটলেও রাইপুর পৌঁছুতে পারব না। তাতে বরং ফল বিপরীত হবে। হয়তো ক্রমশ আমি উল্টোদিকেই চলতে থাকব। তার চেয়ে বরং টিলাটায় ওঠা যাক। টিলাটার উচ্চতা ফুট পঞ্চাশের মত হবে। টিলার ওপরে উঠে রাইপুরের সন্ধান না পাই কাঁসাই নদীটা অন্তত দেখতে পাব। তারপর নেমে কাঁসাইর পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করলে একসময় একটা না একটা পথ চোখে পড়বেই। ছেলেবেলায় ভূগোল বইতে পড়েছি, লোকবসতি নদীর পাড়ে গড়ে ওঠে।

বৃথা আশা। টিলার ওপরে উঠে চারিদিক ভাল করে দেখলাম। কোথায় কাঁসাই। কুয়াশার ঝালরের ভেতর দিয়ে যেটুক এদিকে সেদিকে দেখা যাচ্ছে তা শুধুই পাথুরে অন্ধকার। তার ওপর নেকড়ের দাঁতের মত ধারালো উত্তুরে শীতবাতাসের ঝাপটা। বেশীক্ষণ উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। টিলার মাথা থেকে নেমে আসব ভাবছি এমন সময় পেছন থেকে কেউ যেন ভারি গলায় বলে উঠল, 'কে, কে ওখানে?'

ঘুরে দাঁড়ালাম। ভয় পেলেও ভয়ের মধ্যেও একটা আনন্দের রেশ ছিল। হোক্ ঠ্যাঙাড়ে কিংবা ডাকাত। তবু মানুষ তো। কতক্ষণ বাদে একজন মানুষ দেখছি। বললাম, 'আমি।'

'আমি কে ?'—প্রশ্নকর্তা টিলার পেছনের দিকের ঢালু ভেঙে উপরের দিকে উঠতে লাগল।

'আমি শঙ্কর ভট্টাচার্য।'—নির্জন পার্বত্য প্রান্তরে অন্ধকার রাতে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজের নাম-পরিচয় দেওয়া নিরর্থক জেনেও বলতে বাধ্য হলাম।

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?'—লোকটা আমার কাছে এলে বুঝলাম একজন আদিবাসী। বিরাট, মুস্কমত, দশাসই চেহারা। গায়ে একটা চাদর জড়ানো। চোখদুটো তার নাক বাদে মাথা শুদ্ধ গোটা মুখে একটা কাপড়ের ফেট্টি জড়ানো। হাতে একটা টাঙি। তারার স্বল্প আলোতেও টাঙির ফলাটা চকচক করছিল।

'রাইপুর।'—টর্চের আলো লোকটার মুখে ফেলতে গিয়েও বিপদের আশঙ্কায় নিজেকে সামলে নিলাম।

'রাইপুর, সে তো এখান থেকে অনেক দূরে!'—লোকটা যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'তা হবে। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তারপর অন্ধকারে পথ ভুল করে এদিকে চলে এসেছি।'

'চলো।' লোকটা চাষাড়ে গলায় বলল।

'কোথায় ?'—ভয় পেলেও আমার কণ্ঠস্বরে চিড় ধরল না।

'আমাদের গাঁয়ে।'···লোকটা টাঙিটা একবার সজোরে পাথরে ঠুকল।

'তোমাদের গ্রাম, সে আবার কোথায়'—নির্জন টিলার ওপরে আমাদের কথাগুলো অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছিল।

'বনতোড় আমাদের গাঁ। এখান থেকে কয়েক রশির পথ। ওই তো, ওই শালজঙ্গলটা ছাড়িয়ে।'—অন্ধকারেও লোকটার দুটো চোখ বুনো জন্তুর মতো জ্বলছিল। ঢালুর দিকে পীচ-ঢালা অন্ধকার।

শালবনটন কিছুই আলাদা করে চোখে পড়ল না।

'এই রাতে তোমাদের গ্রামে যাব কেন ? আমাকে ফেরার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও, আমি রাইপুর চলে যাই।'—বিপদে ভয় পেলে বিপদ আরো ঘনিয়ে আসে একথা আমি জানি। তাই জোরের সঙ্গে বললাম।

'একবার যখন দেখা হয়ে গেছে,' হাসতে লোকটার করাতের মত সাদা সাদা দাঁতগুলো চকচক করে উঠল, 'আমাদের সর্দারের কাছে তোমাকে যেতেই হবে বাবু।'

'যদি যেতে না চাই ?'—আমার চোয়াল ভারি হয়ে উঠল। লোকটা আকারে আমার দ্বিগুণ। হাতে টাঙি। তবু ভড়কে যাবার পাত্র আমি নই। কলেজে পড়বার সময় ইউনিভারসিটির স্পোর্টসে দৌড়ে আর হাইজাম্প-লংজাম্পে আমি অনেকবার ফার্স্ট হয়েছি। মাস তিনেক দার্জিলিং-এ থেকে পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নিয়ে সার্টিফিকেটও পেয়েছি। গায়ের জোরে না হোক একবার দৌড়াতে শুরু করলে যে ও আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

'তাহলে জোর করেই নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।'—লোকটা শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলল।

আমি ওর কথায় নিভে গেলাম। সেটা ঠিক ভয় পেয়ে নয়। বুঝলাম, এই অন্ধকার রাতে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় ফের গোয়ার্তুমি করার কোন অর্থ হয় না। দৌড়ে লাভ কি। ছুটব কোনদিকে। তাই বললাম, 'ঠিক আছে, চলো।'

লোকটা করাতের মত সাদা দু'পাটি দাঁত বের করে আবার হাসল, 'এই তো বুঝদারের মত কথা। পালাবার চেষ্টা করলে ফয়দা হত না কিছুই। চারধারেই আমাদের লোকজন লুকিয়ে আছে।'

টিলার পেছনের ঢালু পথ ধরে আমরা দুজন নিচের দিকে নামতে লাগলাম। আকাশের একধারে কালপুরুষ নক্ষত্র মিশকালো অন্ধকারের পটভূমিকায় কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে দু'পা ফাঁক করে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করতে চাও ?'—জিজ্ঞেস করলাম একসময়।

'ভয়ের কিছুই নেই বাবু। আমরা ঠ্যাঙাড়ে কিংবা ডাকাত নই। শুধু সর্দারের সঙ্গে একবার তোমার দেখা করাব। তারপর রাইপুরের পথ আমিই দেখিয়ে দেব।'—লোকটা জবাব দিল।

পাকদণ্ডী ভেঙে আমরা নুড়ি পাথর ভর্তি একটা জায়গার উপর দিয়ে হাঁটছি। মাঝে মাঝে আবার জলও পড়ছে। কনকনে ঠাণ্ডায় জলে গোড়ালি শুদ্ধ বুট জুতো ডুবে যাচ্ছিল। আমি বললাম, 'একি, কোন্ পথে চললে ? এ যে দেখছি জল।'

'এটা একটা মজা সোঁতা। কাদড়। আমার হাত ধরো বাবু!' লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে আমার ডান হাতটা ধরে এগুতে লাগল। বিশাল ওর হাতের থাবা, পাথরের মত শক্ত আর কি ঠাণ্ডা।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে লোকটা আমার হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে কিছু একটা তুলে নিয়ে 'হেইস্-স্' করে একটা অদ্ভুত শব্দ করে সামনের দিকে ছুড়ে দিল। একটু পরেই ঝপ্ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ। ঢিলটিল জাতীয় কিছু। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুকচেরা জান্তব আর্তনাদ। আর মনে হল, কেউ যেন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'ওটা কি পালিয়ে গেল ?'

'শেয়াল। সোঁতার ধারেই শ্মশান, ব্যাটা গর্ত থেকে মড়া টেনে বের করে খাচ্ছিল।'—লোকটা ফের এগুতে লাগল।

সুদীপ্তর কাছে শুনেছি এদিককার শ্মশানের এই হাল। বেশির ভাগ লোক গরিব। বাউরি, বাগদি, লোহার, সাঁওতাল, মাহাতো, তুলে, হাড়ি, মচি, ডোম ইত্যাদি। কাঠ কিনে দাহ করার মত পয়সা না থাকায় মুখে নুড়ো জ্বালিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়ে চলে যায়।

খানিকটা এগুতে শালজঙ্গল পড়ল। রাস্তা তার ভেতর দিয়ে। দু'পাশের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি সেই কালো দেওয়ালের ভেতর দিয়ে অন্ধের মত লোকটাকে অনুসরণ করছি। একসময় মনে হল বাঁদিকে কোথাও ভারি পায়ের আওয়াজ। সেইসঙ্গে শুকনো

ডালপালা ভাঙার মটমট শব্দ। লোকটা দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলল, 'একটুও নড়ো না বাবু, জঙ্গলে বুনো হাতির পাল ঢুকেছে।'

'হাতি, শালজঙ্গলে কেন?' আমি চাপা গলায় প্রশ্ন করলাম।

'ধানপাকার সময়। এখনইতো ওরা ঝিলিমিলির জঙ্গল থেকে নেমে আসে।'—খুব আস্তে টেনে টেনে কথাগুলো বলল লোকটা।

কতক্ষণ আমরা শালজঙ্গলের ভেতরে ছিলাম বলতে পারব না। ঘণ্টাখানেক তো হবেই। তারপর বাইরে বেরুতে আরো ঢালু পথ। দুদিক ক্রমশ দেওয়ালের মত উঁচু হতে হতে মস্ত আকাশটা ঢেকে দিল। শুধু মাথার ওপরে একফালি আঁকাবাঁকা কালো শূন্য। দু'একটা তারা না থাকলে ওটা যে আকাশেরই একটা অংশ তা ধরা যেত না।

আমার বত্রিশ বছরের জীবনে অনেক জায়গায় গেছি। তরাইয়ের জঙ্গলে, থর মরুভূমিতে, সুন্দরবনে, ডুয়ার্সে। কিন্তু এধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এই প্রথম। এরকম নির্জনতা, এমন শ্বাসরুদ্ধকর রাত্রির অন্ধকারে পথ হাঁটা। ভয়টয় আর নেই। পথশ্রমের ক্লান্তিও আর উত্যক্ত করছে না আমাকে। আর ভয় পাবই বা কাকে। এখন এই লোকটাই এই নিঝুম রুক্ষপথে আমার একমাত্র বন্ধু। ভাব জমাবার জন্য বললাম, 'তোমার নাম কি?'

'হামরু।'

'কি করো?'

'খেতের কাজ করতাম আগে।'

'এখন করো না?

'না।'

'কেন?'

'গাঁ থেকে পালিয়ে এসেছি যে!'

'বনতোড় তোমার গ্রাম নয়?'

'না, এখন আছি। আমার বাপদাদার গাঁ মঠকানালি। এখান

থেকে দশ বারো ক্রোশ উত্তরে।'

'সেখান থেকে চলে এলে কেন?'

'চলে না, পালিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

'গোরারা আমাদের গাঁ জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'গোরা' কারা বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম, 'তা হঠাৎ ওরা তোমাদের গ্রাম জ্বালাতে গেল কেন?'

'কি জানি বাবু। শুধু কি মঠকানালি। চারপাশের আর সব গাঁ-ও পুড়িয়ে দিয়েছে।'—বেশ বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলল হামরু। বুঝলাম, এই প্রসঙ্গ নিয়ে ও আর বেশি বাক্যব্যয় করতে চায় না।

'বিয়ে করেছ?'

'করেছিলাম। দুটো বাচ্চাও হয়েছিল।'

আমরা ক্রমশ নিচের দিকে নামছি তো নামছিই। মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত হয়ত পাতালেই পৌঁছে যাব। দু'পাশের পাথুরে দেয়াল কিন্তু একতিল সরছে না।

'এখন ওরা কোথায়?'—ফের প্রশ্ন করলাম।

'হঠাৎ করে পালিয়ে এসেছি গাঁ থেকে, জানি না।'

'কদ্দিন হল বনতোড়ে এসেছ?'

'তা অনেক দিন। বর্ষারও আগে।'

'আশ্চর্য! তারপর থেকে আর বউবাচ্চার খোঁজ নেও নি?'—ওর কথাগুলো গল্পের মত মনে হচ্ছিল।

'নিয়েছিলাম। শুনেছি, গোরারা ওদের পুড়িয়ে মেরেছে।'

এরপরে আর কোন প্রশ্ন করা চলে না। আমি চুপ করে গেলাম।

অবশেষে আমরা বনতোড়ে পৌঁছুলাম। সে এক অবিশ্বাস্য জগৎ। যেন এক আদিম পৃথিবীতে চলে এসেছি আমি।

চারিদিকে ছোট বড় টিলা। মাঝখানে এক বর্গমাইল মত সমতল জায়গা। তার ভেতর ছোটবড় অগুনতি খড়ো ঝুপরি।

সেই ঝুপরিগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লাম। মাঝখানে চতুষ্কোণাকার এক বিরাট পাথুরে চত্বর। চত্বরের সীমানা ঘিরে হাজারখানেক মানুষ। প্রচণ্ড শীতেও ওদের পরনে একখানা করে নেংটি। সারা গায়ে ছাইভস্ম মাখা। বুকে, কণ্ঠার হাড়ে আর গোল করে চোখের চারপাশের পুরু চূনের দাগ। কারুর হাতে তীরধনুক। কারুর হাতে বর্শা, টাঙি, লম্বা লম্বা খাঁড়া। চত্বরের মাঝখানে একজায়গায় কাঠকুটো জ্বলছে। সেই লকলকে আগুনের শিখায় চারদিকের অন্ধকার আরো ভয়াবহ লাগছে। কাউকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু অজস্র চোখের আগুনে-চাউনি জ্বলছে ধ্বকধ্বক করে। নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

আরো অনেক বিস্ময় আর ভয় তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে হামরু টানতে টানতে আগুনের স্তূপ ছাড়িয়ে সামনের দিকে নিয়ে গেল। কাছেই একটা হাড়িকাঠ। সেদিকে চোখ পড়তেই সমস্ত শরীর মুহূর্তে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হাড়িকাঠের সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্ত থিকথিক করছে। অন্যদিকে দুটো মানুষের ধড়। হাড়িকাঠের ওধারে একটা কালো কুচকুচে পাথরের দেবীমূর্তি। ফুট চার পাঁচেক উঁচু হবে। একখণ্ড পাথরের উপরে বসানো। দেবীমূর্তির পদতলে সদ্যছিন্ন মানুষের দু'টো মাথা। দেবীমূর্তির পায়ের কাছে জবাফুলের পাহাড়। ইয়া বড় লকলকে জিভ। বড় বড় দুটো রঙীন পাথরের চোখ। গলায় মুণ্ডমালা। উলঙ্গিনী। এলোমেলো চুল। দেখতে শ্মশানকালী অথবা রাক্ষসীর মতোও বলা যেতে পারে।

আমাদের দেখে দেবীমূর্তির পাশ থেকে একটা বুড়ো মত লোক এগিয়ে এল। গোঁফদাড়িতে ঢাকা মুখ। বাঁহাতে একটা লাঠির মাথায় মরা মানুষের মাথার খুলি বসানো। আরেক হাতে একটা বড় হাড়। দেখে মনে হল, সেটাও মানুষেরই পায়ের হাড়।

বুড়ো লোকটা ঝুঁকে ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখতে লাগল। কি বিভৎস দেখতে নিচের পাটির দাঁতগুলো। বুক না যেন কঞ্চির মত পরপর বসানো হাড়। সবচেয়ে ভয়ের হলো চাউনি। অক্ষিকোটরের মধ্যে চোখ ছুটো দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন একটা অন্ধকার কালো গহ্বর আর সেই গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে হলদে আলোর চোরা ঝিলিক। বুঝলাম, বুড়োটা পুরোহিত বা ওঝা। বিড়বিড় করে আপনমনে কি যেন বলে যাচ্ছিল। একসময় পুরোহিত ইশারা করে হামরুকে কি যেন বলল। হামরু আমায় ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে ঘুরে জোরে একটা শিষ দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি—সেদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা লোক। লোক বললে ভুল হবে, একটা বিরাট চলন্ত কালো পাথরের চাঁই বলাই বোধহয় ঠিক হবে। গলা থেকে হাঁটু অব্দি দেহ পশুচর্মে ঢাকা। ছুটো লোমশ হাত না যেন ছুটো শাল গাছের কাণ্ড। মাথায় এক শালপাতা দিয়ে তৈরি চোঙআলা টুপিজাতীয় কিছু। তাতে ছোট ছোট কড়ি আর নানা-রঙের পাখির পালক বসানো। কোমরে মস্ত বড় একটা খাঁড়া ঝুলছে। বুঝলাম, এই হল হামরুদের সর্দার। রীতিমত রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। হামরু ইশারা করতে আমি সর্দারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। সর্দার বলল, 'একে কোথায় পেলি?'—কি বাজখাঁই গলা। হামরু বলল, 'ধলবনির মাঠে।'

'হুম্, সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'না সর্দার।'

'কি করছিল লোকটা?'

'একটা টিলার ওপরে উঠেছিল। তখন আমি পাকড়াও করি।'

'কেন ঘোরাফেরা করছিল বলেছে কিছু?'

'হ্যাঁ সর্দার। বলেছে, রাইপুরে দোস্তের কাছে এসেছে। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দিগ্‌ভুল করে—'

'কি বললি', সর্দারের একটু কুজো হয়ে থাকা দেহটা মুহূর্তে টানটান হয়ে উঠল, 'রাইপুর!'

একটা ধ্বনি ফুঁসে উঠল, 'রাইপুর, রাইপুর।'

'কি নাম তোমার বাঙালিবাবু?'

'শঙ্কর ভট্টাচার্য।'

'কোথায় থাকো?'

'কলকাতায়।'

'অঃ। রাইপুরে কে আছে তোমার?'

'বন্ধু সুদীপ্ত—'

'কি করে সে?'

'ইঞ্জিনীয়ার।'

'কি বললে, ইনজি—'

'রাস্তাঘাট বানায়—'

পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে সর্দার ক্রূর হাসি হাসল। বলল, 'বটে, বটে। তা রাইপুরে কোথায় থাকো?'

'পি.ডব্লুউ. ডি. বাংলোতে। ব্রীজের পাশেই।'

'কি বললে, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

খেয়াল হল এরা আদিবাসী। তাই ভাল করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, 'কাঁসাই নদীর ওপর একটা বড় ইটের সাঁকো তৈরি হয়েছে না, তারই পাশে।'

'রাইপুরে নদীর ওপর সাঁকো!' অদ্ভুত হাসল সর্দার। তারপর হামরুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাটা, বাবুকে পথে হাড়িয়া খাইয়ে নিয়ে এসেছিস নাকি?'

সর্দার থামতে চারদিকে হাসির হট্টরোল উঠল। কি কুৎসিত সেই হাসি। বুকের রক্ত যেন জল করে দেয়।

ভয়, উৎকণ্ঠা ক্লান্তির মধ্যেও একটা ব্যাপার আমাকে বার বার অবাক করে দিচ্ছে। এরা আদিবাসী। আর আমি কলকাতা শহরের লোক। অথচ এদের সঙ্গে কেমন অনায়াসে কথা বলছি। এদের দেহাতি ভাষা বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে না আমার।

এরপরে আমার চরম বিপদ ঘনিয়ে এল। কোত্থেকে একটা লোক ঝুপরিগুলোর ওধার থেকে ছুটে এল উর্ধ্বশ্বাসে। এসে

দাঁড়াল সর্দারের সামনে। সচকিত হয়ে সর্দার বলল, 'কি হয়েছে রে বুধন?'

বুধন নামে লোকটা বলল, হাঁপাতে হাঁপাতে, 'দারুণ খারাপ খবর সর্দার। রাইপুরের ছাউনি থেকে গোরারা পল্টন নিয়ে এগিয়ে আসছে।'

'সেকি!' সর্দারের দু-চোখ আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল, 'ওরা কদ্দূর এসেছে?'

'ঘোড়াধরার কাছাকাছি।'

কি যে ব্যাপার আমি তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না।

'হুঁ', সর্দার এবার আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গর্জে উঠল 'শয়তান, গোরাদের চর।'

স্বপ্ন দেখছি না তো। কিন্তু তা কি করে হবে। লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে সর্দার যে আমার গলা চেপে ধরেছে। ওর হাতের নিষ্পেষণে আমার দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। আমি সামান্য একটু কাতরোক্তি করতে পারছি না পর্যন্ত।

পুরোহিত এগিয়ে এসে বলল, 'ছেড়ে দাও বাবুকে। ওর শাস্তির ভার তুমি নিজের হাতে নিতে পারো না। সামনে যখন দেবী আছেন—'

বিকট চিৎকারে জায়গাটা গমগম করে উঠল। হাজার হাজার লোকের চোখেমুখে সেকি উল্লাস! যমদূতের মত দু'টো লোক এসে আমাকে শক্ত করে ধরল। পুরোহিত রাক্ষসী মূর্তির কাছে গিয়ে কয়েকটা জবা ফুল নিয়ে এল। তারপর আমার মাথায় সেই ফুলগুলো ঠেসে ধরে বিরবির করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব যেন আওড়াতে লাগল।

ততক্ষণে হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠেছে। যেদিকে তাকাই অন্ধকারে শুধু আগুনের গোলা। একসময় রক্ত জল করা বাজনা বেজে উঠল। ড্রিম-ড্রিম, ড্রিম-ড্রিম········

যমদূত দুজন আমাকে টানতে টানতে হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে

যাচ্ছে। আমি বুক ফাটানো চিৎকার করে বলতে চাইলাম, 'সর্দার বিশ্বাস করো, আমি গোরাটোরাদের চিনি না—'

কয়েকশ' ঢাকের আওয়াজ। আমার চিৎকার ডুবে গেল। আমাকে ওরা হাড়িকাঠে ফেলল।

সামনে লোলজিহ্বা রাক্ষুসী পাষাণ-প্রতিমা। দু'জন দু'দিক থেকে আমার দু'হাত চেপে ধরেছে। আরেকজন আমার অবাধ্য পা' দুটো মাটিতে ঠেসে ধরল। ঘাতক এগিয়ে আসছে। আমার বুকে বলির বাজনা বাজছে। আমি চোখ বুজলাম।

হঠাৎ ঢাকের বাজনা থেমে গেল। যারা আমার হাত পা ধরেছিল তারা আমায় ছেড়ে ছুট লাগাল। এলোমেলো বিশৃঙ্খল চিৎকার। বন্দুকের গুলীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। চাতাল থেকে লোকজন যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। সর্দার কিংবা পুরোহিতকেও দেখতে পাচ্ছি না।

ভোজবাজি নাকি! হাড়িকাঠ থেকে উঠে এলাম। হয়ত তাই। আবার আরেক দৃশ্য। ঝুপরিগুলোর ওধার থেকে কিসের একটা আওয়াজ এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ না! হ্যাঁ, তাইত। তবে একটা দুটো নয়, অন্তত শ'খানেক অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদের মধ্যে কিছু ভারতীয় কিছু ইংরেজ।

সব ব্যাপারটা খুটিয়ে দেখবার মত মানসিক অবস্থা এখন আমার নেই। আমি ছুট লাগালাম, আদিবাসীরা যেদিকে পালাচ্ছে তার বিপরীত দিকে। ছুট, ছুট. ছুট। সেকি দৌড়। টিলার ধার ঘেঁসে ছুটবার সময় বারকয়েক প্রচণ্ড হোঁচট খেলাম। পায়ের নানা জায়গা থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ম্যারাথন দৌড়ও বুঝি এর কাছে তুচ্ছ। পেছনে তখন আদিবাসী বস্তীতে, ঝুপরিগুলো যেদিকে সেদিকে, আগুন লকলক করে অন্ধকার আকাশটাকে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে চাইছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই আমার। সামনে শুধু অন্ধকার। কোথায় গিরিখাদ, কোথায় গহ্বর কিছুই জানি না। শুধুই ছুটে চলেছি অবিশ্রাম।

পরদিন সকালে ন'টা নাগাদ আমার জ্ঞান ফিরে এল। বাংলোর ঘরে শুয়ে আছি আমি। চোখ মেলতে দেখি, পাশে একটা ছোট টুলে বসে আছে সুদীপ্ত। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ভবতোষবাবু। স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার। আর পায়ের কাছে এক চেয়ারে স্টেথিসকোপ গলায় ডাক্তারবাবু।

'কিরে শঙ্কর, এখন কেমন আছিস?'—আমার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করল সুদীপ্ত। টের পেলাম, আমার পায়ে এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সারা শরীরে একটা বিষব্যথা চলকাচ্ছে।

'ভালই।'—বললাম।

ডাক্তারবাবু উঠে এসে আমার নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, 'পালস বিট নরম্যাল। যাক্, শেষপর্যন্ত জ্বরটর আসে নি এই রক্ষে। আঘাতও খুব সামান্য। দু'টো দিন চুপচাপ শুয়ে থাকুন। সেরে উঠবেন।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাল হলেই ভাল। কোথায় কলকাতা থেকে এসেছেন দু'টো দিন আমোদ ফূর্তি করবেন তা নয়—'

সুদীপ্তর কাছে কাল রাতের শেষের ঘটনাটুকু শুনলাম। মুকুটমণিপুর থেকে রাইপুরে ফিরতে ওর রাত হয়ে যায়। এসে দেখে আমি নেই। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। রাইপুরের চারপাশ আঁতিপাতি করে দেখা হয়। এদিকে কাল সন্ধ্যাতেই বাঁকুড়া শহর থেকে বিকল জিপটা এসে গেছে। সেই জিপে চেপে অফিসের দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার সন্ধান পায় অনেক দূরে। রাইপুর থেকে দশ বারোমাইল উত্তরে, শালগোদা নামে একটা জায়গায়। পাকারাস্তার ওপরে আমি নাকি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম।

সমীরবাবু সুদীপ্তর অফিসে ড্রাফট্স্‌ম্যানের চাকরি করে, শুধোল, 'কালরাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন শঙ্করবাবু?'

সব কথা খুলে বলার মত শারীরিক কিংবা মানসিক অবস্থা আমার নেই। সংক্ষেপে বললাম, 'বনতোড়ে।'

'বনতোড়ে? অ্যাঁ, বলেন কি মশাই!'—ঘরের ভেতর যেন বজ্রপাত হল। ভবতোষবাবুর গলা আর্তনাদের মত শোনাল। ভবতোষবাবু

শুধু স্থানীয় স্কুলের পুরনো হেডমাস্টারই নন, এ অঞ্চলের অতীত-বর্তমানের নাড়ীনক্ষত্র সবকিছু জানেন।

সুদীপ্ত ভবতোষবাবুর দিকে তাকাল, 'বনতোড়টা কোথায় মাস্টার-মশাই? এরকম জায়গার নাম এর আগে তো কখনো শুনি নি।'

ভবতোষবাবুর মুখখানা সকালের রাঙা আলোতেও আষাঢ়ে মেঘের মত কালো আর থমথমে হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'শুনবেন কোত্থেকে মশাই। জায়গাটার এখন যে কোন অস্তিত্বই নেই।'

'মানে?'—আমি উঠে বসতে চাইলাম।

'ছিল একসময়। আজ থেকে দু'শো আড়াইশো বছর আগে। ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহের কথা পড়েছেন না! বনতোড় ছিল এঅঞ্চলে সেই বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। ইংরেজরা তোপের মুখে জায়গাটা উড়িয়ে দেয়। তারপর কাঁসাই নদীর বন্যায় ডুবে পলিমাটির তলায় চাপা পড়ে যায় বনতোড়।'

আমি আরো কিছু প্রশ্ন করবার জন্য উদ্যত হলে সুদীপ্ত আমায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'এখন তোর শরীর ভাল নেই। সেরে ওঠ। তারপর ধীরেসুস্থে সব শুনবি ভাল করে।'



নীলগঞ্জের কালরাত্রি

বারাসত থেকে একাশি নম্বর বাসে চেপে ব্যারাকপুর ফিরছিলাম। আমাদের বাড়ি চিড়িয়ামোড়ে। বারাসত কালীবাড়ির কাছে অফিসের এক সহকর্মীর বাড়ি। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম। প্রথম ছেলে, যা হয়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ফলে খাওয়া সারতে সওয়া ন'টা হয়ে গিয়েছিল। বারাসত থেকে রাতের শেষ একাশি নম্বর বাস ছাড়ে রাত সওয়া নটায়। সহকর্মীর বাড়ি বারাসত রোড়ের ধারেই। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। দূর থেকে বাসের হর্ন শুনতে পেয়ে পানের জন্য অপেক্ষা না করে রুমালে মুখ মুছেই লাগালাম ছুট।

স্টপ বেশ দূরে। মফস্বলের বাস। ড্রাইভার করুণাপরবশ হয়ে আমি হাত তুলতেই বাস থামাল। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে ভেতরে ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মাঘ মাস। তেমন যাত্রীর ভিড় ছিল না। কাজিপাড়া আসতে বসারও সীট পেয়ে গেলাম।

কিন্তু কপালে ভোগান্তি থাকলে আটকাবে কে। মাইল তিনেক এগুতে শুরু হয়ে গেল বেগোড়বাই। ঘর ঘর শব্দে বিশ্রি এক আওয়াজ তুলে বাসটা মাঠের মাঝখানে থেমে গেল হঠাৎ। দুধারে পীচ-ঢালা অন্ধকার। প্রথমে কণ্ডাক্টর নেমে পাশের নয়নজুলি থেকে বালতিতে করে জল এনে ইঞ্জিনে ঢালল। তারপর হ্যাণ্ডেল মারতে শুরু করল। পুরানো লজঝড়ে বাস। হাড়-পাঁজরা সমেত ঘর ঘর করে কাঁপল কিছুটা সময়। তারপর ভুস-ভুস করে কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল।

কণ্ডাক্টর এগিয়ে এসে বলল, 'নেমে আসুন সবাই। ঠেলতে হবে।'

নেমন্তন্ন খাওয়া ভরপেট। তার ওপর সারাদিনের ক্লান্তি। কোন্ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে

শিয়ালদহ থেকে ভিড়-ঠাসা বনগাঁ লাইনের ট্রেনে চাপা। শরীর আর চলছিল না। তবু নামতে হল। সুফল ফলল শেষপর্যন্ত। কয়েক কদম ঠেলাঠেলির পর বাস চলতে শুরু করল। আমরা আবার ফের যে যার সীটে এসে বসলাম।

কপাল ভাঙল নীলগঞ্জে এসে। এতটা পথ কোনরকমে কেৎরে-কুৎরে এসে নীলগঞ্জে পৌঁছে ড্রাইভার সীট থেকে নেমে জানলার ধারে এসে চাষাড়ে গলায় ঘোষণা করল, 'বাস আর যাবে না। ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে।'

যাত্রীদের মধ্যে আমরা ক'জন যারা ব্যারাকপুরে যাব তারা এক যোগে প্রতিবাদ করে উঠলাম। কিন্তু কে তার কথা শোনে। কণ্ডাক্টর-ড্রাইভার আমাদের কথার কোন জবাব না দিয়ে সোজা পাশের এক চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল।

অগত্যা রিক্সার জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিলাম। জাফরপুর অব্দি পৌঁছুতে পারলেও হয়। জাফরপুর এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে। সেখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। এই পথটুকু আমার অচেনা নয়। কলেজে পড়তে একাধিকবার এদিকে এসেছি পিকনিক করতে। কিন্তু এত রাতে এপথে হাঁটা, শুনেছি আজকাল নাকি এদিকে প্রায়ই চোরাগোপ্তা ছিনতাই-রাহাজানি হচ্ছে। এইসব সাতপাঁচ ভাবছি এমন সময় পেছন থেকে কেউ যেন ডাকল, 'শঙ্করদা না?'

ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি, ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের এক যুবক। বেশ লম্বা চওড়া, স্বাস্থ্যবান। গায়ে একটা জ্যাকেট। মাথায় কান-ঢাকা টুপি। দু'হাতে চামড়ার গ্ল্যাভস পরা। কাছে এসে বলল, 'এত রাতে, আপনি এখানে!'

চেনাচেনা মনে হল। বললাম, 'আর বোলো না। বাসটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় আটকে পড়েছি। একটা রিক্সাটিক্সা—'

যুবকটি বলল, 'রাত সওয়া দশটা বাজে। তাছাড়া আজ উত্তরপাড়ায় যাত্রা হচ্ছে। সব ব্যাটা সেদিকে গেছে। আজ রাতে আর রিক্সা পাওয়া যাবে না।'

মাথায় বাজ পড়লেও এতটা বিচলিত হতাম না। চিন্তিত গলায় বললাম, 'মহা ঝামেলায় পড়লাম যে। এখন কি করি বলোতো—'

'কি আর করবেন। কাল তো রবিবার। একটা রাত না হয় আমাদের এখানেই কাটাবেন।'—যুবকটি কথা শেষ করলে চিনতে পারলাম ওকে। মনে পড়ে গেল, রমেন নীলগঞ্জে স্কুলে টিচারী করে। রমেন আর আমি এক সঙ্গে ব্যারাকপুর কলেজ থেকে পাস করেছি। কলেজ ছেড়ে আমি ঢুকি কলকাতার এক সওদাগরি অফিসে। আর রমেন নীলগঞ্জের কোন এক স্কুলে। সাত আট বছর হল রমেনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। যুবকটি রমেনের ভাই। ওর নাম রবীন। কলেজে আমাদের চেয়ে দু'ক্লাস নিচে পড়ত। ভাল ফুটবল খেলত রবীন। কলকাতার সিনিয়র ডিভিশন লীগেও খেলেছে কয়েকবছর। পিঠোপিঠি দু'ভাই। থাকত ব্যারাকপুর সদরবাজারের দিকে। মামার বাড়িতে। ওদের বাবা মা তখন বাংলাদেশে ছিল। অন্ধকারে ঢিল ছুড়লাম, 'তুমি মিলিটারীতে ছিলে না রবীন ?'

রবীন হাসল, 'হ্যাঁ, এ্যাদ্দিন বাদেও দেখছি সে কথা আপনার মনে আছে শঙ্করদা।'

কাল ছুটির দিন। অফিসে যাবার তাড়া নেই। রাতে ফিরতে না পারলে বাড়ির লোকজন কিছু মনে করবে না। বুঝবে, সহকর্মীর বাড়ীতে থেকে গেছি। শীতের রাতে রবীনকে জাফরপুর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া, আবার ওকে এতটা পথ ফিরে আসতে হবে, এধরনের অনুরোধ করাটা অমানবিক। তাছাড়া, রমেনের সঙ্গেও দেখা হয় না বহুকাল। গল্পগুজব করে পুরনো দুই বন্ধুতে মিলে একটা রাত ভালোই কাটানো যাবে। এইসব সাতসতের ভেবে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, 'চলো, তোমাদের ওখানেই যাই।'

নীলগঞ্জ আধাগঞ্জ আধাগ্রাম মতন জায়গা। খানিকটা পথে ইলেকট্রিক আলো ছিল। তারপরেই অন্ধকার। শীতকাল। শুকনো রাস্তাঘাট। সাপখোপের উপদ্রব নেই এই সময়। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না। চাদরে মাথা ঢেকে নিয়ে বললাম, 'তোমার মা বাবা কি এখন

এখানে আছে রবীন ?'

রবীন আমার সামনে। উত্তর করল, 'না। দেশেই আছে পাবনায়।'

'সেকি', আমি বিস্মিত হলাম, 'এখনও পাবনায়। এখন তো ছ'ভাই রোজগার করছ। ওদের নিয়ে এলেই তো পারো। বুড়ো বয়সে একলা পড়ে থাকা—'

'চেষ্টার কি কম করেছি। মাঝখানে একবার পাবনায় গিয়েও ছিলাম। কত করে বললাম। ওরা কিছুতেই আসতে চায় না। বলে, 'এতগুলো বছর যখন এখানেই কাটিয়ে দিলাম তখন মরলে বাপদাদা চোদ্দ-পুরুষের ভিটেতেই মরব। কিছুতে এল না।'—জবাবে বলল রবীন।

কখন ঘন বসতি পেরিয়ে ফাঁকায় এসে পড়েছি। আমরা পুকুরের ধার ঘেঁষে, শিবমন্দির ছাড়িয়ে পাশের খেতের সরষে ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে, ধানের মরাই'র পাশ দিয়ে এগুচ্ছিলাম।

শুধোলাম, 'তোমাদের বাড়ি আর কদ্দূর রবীন ?'

'আরো মিনিট দশবারোর পথ। দাদার কাণ্ড, আর বলবেন না শঙ্করদা! এদিকে জমি এত সস্তা। তবু কেন যে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে এতদূরে বাড়ি করতে গেল।' রবীনের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের আভাস পেলাম।

'ঠিক বলেছ। বরাবর দেখেছি', রমেনের বাস্তববোধের খুবই অভাব। হাঁটতে আমারও বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। ওর কথায় সায় জানালাম।

'আর বলবেন না শঙ্করদা, কত বলেছি তখন, এতদূরে বাড়ি করো না। তোমার শরীর ভাল নয়। কিন্তু যা একগুঁয়ে। বলেছে, খোলামেলায় থাকব বলেই তো এখানে মাস্টারি নিয়ে আসা। ফুলের বাগান, সবজির খেত করতে না পারলে গ্রামে থাকার চার্ম কোথায় ?'

রবীন বলা শেষ করলে আমি চুপ করে গেলাম। সত্যি, রমেনটা বড় খামখেয়ালি আর এলোমেলো ধরনের। কলেজে পড়তে কবিতা লিখত। সেসব কবিতার কিছু পত্রিকা-টত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে রমেন ছিল ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করত না। নোংরা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াত এমনি করে অসুখে

ধরেছিল ওকে। বুকে জল বসে প্লুরিসি হয়েছিল একবার। মাসছয়েক ছিলও ব্যারাকপুর টি. বি. হাসপাতালে। রবীন স্বভাবে রমেনের ঠিক বিপরীত। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওর ছিল ভীষণ নজর। একসারসাইজ করত। শুধু ভাল ফুটবলার নয়, মহকুমায় নাম করা স্পোর্টসম্যানও ছিল। সব ব্যাপার নিয়ম মেনে চলত। দু'জন দু'মেরুর হলে কি হবে, দাদা বলতে অজ্ঞান ছিল রবীন। এরকম ভ্রাতৃভক্ত ছেলে এ যুগে দেখা যায় না। রমেনকেও ছায়ার মত আগলাতে চেষ্টা করত। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রমেনকে সামলাতে পারত না রবীন। শরীর একটু সারল কি রমেন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তখন শুরু হয় খোঁজ। ওকে সেই কোন আরামবাগের কাছের এক গণ্ডগ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এল রবীন।

কিছুটা পথ এগুবার পর ডানদিকে অল্পখানিক দূরে জলার ধারে এক জায়গায় দেখলাম আগুন জ্বলছে। সেদিকে চোখ পড়ায় যেন শিউরে উঠল রবীন। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এ পথে যাব না শঙ্করদা। চলুন, বাঁদিকের কলাই খেতে নামি।'

'কেন, দিব্যি তো রাস্তা। মিছিমিছি কলাই খেতে নামব কেন?' প্রশ্ন করলাম।

'দেখছেন না, মড়া পুড়ছে। ওটা শ্মশান।'

'তাতে কি হয়েছে। গাঁয়ে তো এমনি পথেঘাটেই শ্মশান পড়ে,'—আমার কথা শেষ হবার আগেই মাথার ওপর দিয়ে বিকট ডানা ঝাপটে মস্ত বড় কালো কয়েকটা পাখি উড়ে গেল। শকুনটকুন হবে আর কি!

'না শঙ্করদা, ও পথে যাব না,' বেশ জোরের সঙ্গেই বলল রবীন, 'রাত হলেই ওদিকে ভূতের দারুণ উৎপাত।'

'ভূত?' হেসে উঠলাম, 'তুমি না মিলিটারিতে আছো রবীন।'

'খামাকা গোঁয়ার্তুমি করে লাভ কি শঙ্করদা', বলে রবীন বাঁদিকের খেতে নেমে পড়ে বলল, 'গেঁয়ো ভূত। ব্যাটারা দারুন খচড়া। ভীষণ জ্বালায়। বিশেষ করে শহুরে লোক দেখলে তো আর কথাই নেই।'

অগত্যা আমিও কলাই খেতে নামলাম। রবীনের কথা শুনে ভয় নয় মজা পেলাম আমি। বললাম, 'তোমাকে ওরা পাকড়াও করেছিল নাকি?'



'সে কি একবার', রবীনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, 'ওখানে ভূতের আড়ত রয়েছে বলতে পারেন। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, শাকচুন্নী, জলার পেত্নী কি নেই! গ্রামের যত হাড়হাভাতেদের তো ওই শ্মশানেই দাহ করা হয়।'

'বটে!'—আমি রসিকতার সুরে বললাম, 'তা তোমাকে ওরা কি করেছে?'

'কি করে নি বলুন', চাপা গলায় বলল রবীন, 'কতবার মাথায় পেচ্ছাব করে দিয়েছে। টুপি কেড়ে নিয়েছে। হাত ধরে টানাটানি করেছে। একবার তো হাত থেকে দামী রিস্ট ওয়াচটাই কেড়ে নিল। লক্ষ্য করেছি, ওদের যত রাগ সব আমার ওপরেই।'

'তা, হঠাৎ তোমার ওপরেই ওদের এত রাগের কারণটা কি, সেটা কি ভেবে দেখছ ?'—আমি প্রশ্ন করলাম।

মাথার ওপর এক আকাশ তারা। শীতের উত্তুরে বাতাসের কাঁপন। তবে গল্পে গল্পে বেশ পথ হাঁটছি। রবীন বলল, 'কে জানে। শহুরে লোক বলেই হয়তো ওরা সহ্য করতে পারে না আমাকে।'

অবশেষে রমেনের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে মিষ্টি ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল। দুধারে বাগান। সামনে বাড়ি। বাংলো প্যাটার্নের। ইটের দেয়াল। মাথায় টালীর চাল। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। ওপরে উঠে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আমি সভয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার, এত রাতেও দরজা খোলা। ভেতরে চোরটোর ঢোকে নি তো!'

রবীন হাসল, 'নাহ্, দাদার স্বভাব তো জানেন। দরজা খুলেই কোথাও চলে গেছে।'

ভেতরে ঢুকলাম। রবীন আলো জ্বালিয়ে মেঝের এক কোণায় রাখল। ছোট একটা টেবিল ল্যাম্প। তাতে ঘরের অন্ধকার যাবার কথা নয়।

অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম ঘরে ইলেকট্রিক তার আছে। মাথার ওপরে ঝুলছে একটা ইলেকট্রিক বাল্ব। বললাম, 'সুইচ টিপে আলো জ্বালো না। যা অন্ধকার।'

'জ্বালব বললেই কি জ্বালা যায়,' রবীন জবাব দিল, গতবার এসে আমি নিজে ওয়ারিং করিয়েছি। দাদাকে তো জানেন, কিছুতেই কানেকশান আনতে দিল না। বলে, ইলেকট্রিক আলো জ্বাললে নাকি ঘরের রোমান্টিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে।'

'পাগল আর কাকে বলে।'—আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ঘরের মধ্যে একটাই খাট। বিছানার কি দশা! তুলোওঠা লেপ-তোশক-বালিশ। একটা চাদর পর্যন্ত নেই। ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল। মেঝেয় পুরু ধুলো। সব জানলা বন্ধ। একটা ভ্যাপসা দমবন্ধ করা ভাব। মাথা-ভাঙা কুজোটা একধারে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'উফ্,' আমার রাতটা এখানে কাটানোর রমনীয় ইচ্ছেটা মুহূর্তে উবে গেল। বললাম, 'ঘোরদোরের কি ছিরি। এখানে থাকব কি করে?'

আমার কথায় রবীনও উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ঠিক বলেছেন শঙ্করদা। কত বলেছি, ঘরদোর একটু পরিষ্কার করে রাখো। দু'চার-জন ভদ্রলোক তো আসেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আমার কথা কানেই নেয় না। কবি যে!'

ওর ব্যঙ্গের ঝাঁঝটুকু আমাকেও অসহিষ্ণু করে তুলল। বললাম,'কবি না হাতি! দারুণ বাউণ্ডুলে ও। এতদিনেও স্বভাবটা ফিরল না, আশ্চর্য!'

যা'হোক করে খাটের এক প্রান্তে গুটিসুটি বসে পড়লাম। উপায় কি। কপাল মন্দ। আমার সব রাগটা গিয়ে পড়ল অফিসের সহকর্মীটির ওপর! একটু আগে খেতে দিলে এই দিগ্‌দারিতে পড়তে হত না।

বললাম, 'রাত তো মন্দ হল না। রমেন কোথায় গেছে?'

'কে জানে', বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল রবীন, 'হয়তমাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির শোভা দেখছে।'

'এ যে দেখছি পুরো পাগল হয়ে গেছে রমেন। এই দারুণ ঠাণ্ডায়—

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বলল রবীন, 'তার ওপর শরীরের যা হাল। এখনও কাশির সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত ওঠে।'

'বলো কি! তা তুমি বারণ করলে না কেন এই রাত্তিরে বেরুতে।'

'বারণ করব কি! আমিও তো আজকে ফিরছি। আপনার একটু আগেই।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'—সরসর শব্দে দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে কিছু একটা চলে যেতে আমি খাটে পা তুললাম।

'কোথায় আবার। আমি তো আজই দাদার শরীর খারাপ শুনে ক্যান্টনমেণ্ট থেকে ফিরছি।'—বেশ রাগের সঙ্গেই বলল রবীন।

'তুমি এখন কোথায় পোস্টেড আছো?'—জিজ্ঞেস করলাম।

'পানাগড়ে। এই তো গত মাসে ক্যাপ্টেন হয়েছি।'

'বাঃ, তাহলে তো খুব সুখবর।' নড়ে-চড়ে বসলাম, 'এবার দাদার জন্য পাত্রীটাত্রীর খোঁজ করো।'

'চেষ্টার কি কম করেছি শঙ্করদা,' হতাশ সুরে বলল রবীন, 'কিন্তু টি. বি. শুনে কেউ এগোয় না।'

একথার কোন জবাব জানা নেই আমার। বললাম, 'ভীষণ একটা দমপচা গন্ধ পাচ্ছি। একটা জানলা খুলে দাও না রবীন।'

রবীন উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকের একটা জানলা খুলে দিতেই খানিকটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। আরাম বোধ করলাম। দূরে, জানালার ওধারে অন্ধকার মাঠে লকলক করে আগুন জ্বলছে। বুঝলাম, শ্মশান ওদিকটাতেই।

একটু বাদে দূরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বা কারা আসছে। রবীন খাট থেকে উঠে পড়ল। বলল, 'একটু বসুন শঙ্করদা ওই বুঝি দাদা আসছে। আমি আসছি এক্ষুণি।'

রবীন বেরিয়ে গেছে। প্রায়ান্ধকার ঘরে আমি একা। আমার কান্না পাচ্ছিল। এই ঘরে সারাটা রাত এক আধ-পাগলা বন্ধুর সঙ্গে কাটাতে হবে! এ যে নরক যন্ত্রণার চেয়েও কষ্টদায়ক। ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে ঘরে। তবু কি ভ্যাপসা, পচা গন্ধ।

খানিকবাদে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল রবীন নয়, রমেন। আধো অন্ধকারেও ওর রোগাপলকা চেহারাটা এবং ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে চিনতে পারলাম। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'রমেন না!'

রমেন যেন ভূত দেখল। বলল, 'কে, আপনি?'

'আমি শঙ্কর। চিনতে পারলি না।'

'ও শঙ্কর, এতদিন বাদে এখানে তুই!' রমেনের কণ্ঠস্বরে ভয়ার্ত ভাব।

'বারাসাত থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ নীলগঞ্জে এসে বাস বিগড়ে গেল। তারপর রবীন ধরে নিয়ে এল এখানে।'

'কে, রবীন?'—চমকে উঠল রমেন, 'কোথায় সে?'

'তোকে খুঁজতেই তো এই কিছুক্ষণ হল এখান থেকে বেরিয়েগেল।

'আমাকে খুঁজতে?'

'হ্যাঁ।'

'কতবার বলেছি ওকে, এভাবে রাতে-বিরাতে এখানে আসবি না। আমার কথা কি শোনে?'

'তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

'যাত্রা শুনতে।'

'তোর শরীর খারাপ।' এই ঠাণ্ডায় তোর যাত্রা শুনতে না গেলেই কি হোত না! এখনো দেখছি আগের মতই আছিস।

'রবীন কোথায় গেল?'—আমার কথা কানে না তুলে প্রশ্ন করল রমেন।

'তা আমি কি করে বলব।'—বিরক্ত বোধ করলাম।

'প্লিজ শঙ্কর' অনুনয়ের সুরে বলল রমেন, 'তুই আর পাঁচ মিনিট বোস। পথঘাট ওর ভাল করে চেনা নেই। এক্ষুণি আমি রবীনকে নিয়ে ফিরে আসছি।'

বেশ অনেকক্ষণ বসে আছি ঘরে। রবীন কিংবা রমেন কেউই আসে না! অসহ্য পচা. ভ্যাপসা গন্ধ। এক সময় রেগেমেগে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম।

খানিক বাদে রাস্তায় আবার পায়ের শব্দ। এক নয়, একাধিক। দলবেঁধে কিছু লোক সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার সিগারেটের আলো দেখতে পেয়ে একজন বলে উঠল, 'কে, কে ওখানে?'

গলায় সর্দি টেনে নিয়ে জবাব দিলাম, আমি—'

'আমি কে?'

টর্চের আলো এসে পড়ল আমার মুখে। বারান্দা থেকে নেমে পড়তে পড়তে বললাম, 'আমি রমেন মিত্রর বন্ধু।'

'রমেন মিত্র!' একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল।

'হ্যাঁ, কেন?' গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। অনেকগুলো টর্চের আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

কথায় কথায় ওদের সঙ্গে নীলগঞ্জবাসস্টপে চলেএলাম। তখন চারদিক ফর্সা হয়ে উঠেছে। ওদের কাছ থেকেই সব কথা জানতে পারলাম।

ওরাও যাত্রা দেখে ফিরছিল। গত বছর এমনি শীতের রাতে মোটরবাইক চালিয়ে পানাগড় থেকে নীলগঞ্জে এসেছিল রবীন। দাদার অসুস্থতার খবর পেয়ে এবং ঠিক নীলগঞ্জের মোড়েই মোটরবাইক একটা বটগাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলি চৌচির হয়ে মারা যায় রবীন। সে-সময় ঘরেই ছিল রমেন। এক প্রতিবেশীর কাছে খবরটা পেয়ে অন্ধকারে অসুস্থ শরীরেই বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটতে থাকে রমেন। তার পর পথের মধ্যে আরেক দুর্ঘটনা। একটা বাঁশের সাঁকো পেরোবার সময় টিপ করে পড়ে যায় নিচের কাদা-পাঁক আর বাঁশের টুকরো-টাকরা বোঝাই খালে। পরদিন ভোরে এক বুড়ি খাল পাড়ে সুষনি শাক তুলতে এসে ওর ডেডবডি আবিষ্কার করে।

নীলগঞ্জের যাত্রা ফেরত সেই কটি লোকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ওরা সেদিন বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত নিয়ে এসে দোকানীকে ডেকে ঝাঁপ খুলিয়ে আমাকে চা খাইয়ে চাঙা করে। তারপর ভোরের প্রথম একাশি নম্বর বাসে তুলে দেয়।



মহাযুদ্ধের ইতিহাস

ভূতের গল্প বলতে, শুনতে, পড়তে কিংবা ভূত নিয়ে ভাবতে কার না ভাল লাগে। ভূতের গল্প মানেই এক গা ছমছম কাল্পনিক অনুভূতির রাজ্যে চলে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, ভূতটুত বলে আদপে কিছু নেই। যারা মনের দিক থেকে দুর্বল বা যারা বেশি কল্পনাপ্রবণ তারাই নাকি মুহুর্মুহু ভূত দেখে। আসলে, এদের মতে, ভূত-দেখাটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এনিয়ে তর্ক করা বৃথা। কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক আমি কিন্তু জীবনে একাধিকবার ভূতের মুখোমুখি হয়েছি। সেই দেখা পাওয়াটার কতটুকু খাঁটি আর কতটুকুই বা ভয় পেয়ে খোয়াব দেখা তা বলতে পারব না। তবে অভিজ্ঞতা হিসেবে সেগুলি যে রীতিমত রোমহর্ষক তাতে আমার মনে অন্তত কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই।

তবে হ্যাঁ, আমি যে অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলতে বসেছি তা কিন্তু মোটেই ভীতিজনক নয়। বরং, এমন এক ভূতের গল্প তোমাদের বলব যে ভূতের জন্য ভয় পেয়েও শেষপর্যন্ত আমাকে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়েছিল।

উনিশশ' সাত চল্লিশ শালের গোড়ার দিকের কথা। আমি তখন বছর বারোর ছেলে। পড়ি ক্লাশ সিক্সে। থাকতাম মামাবাড়িতে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের এক মহকুমা শহরে। নাম পিরোজপুর। দাদামশাই ছিলেন মোক্তার। আমাদের পাড়া ছিল একেবারে শহরের পূব-প্রান্তে। পাড়ার শেষে খেলার মাঠ। তারপর মস্ত বড় এক শ্যাওলা-ভরা পুকুর। পুকুরের ওধারে আঁশস্যাওড়ার জঙ্গল, বাঁশঝাড় আর বুনো ঝোপ। এছাড়া কয়েকটা ঢ্যাঙা তালগাছও ছিল। সাপ-শেয়াল-গোঁসাপ আর গন্ধগোকুলের আস্তানা ছিল বলেই আমরা পুকুরের ওধারে যেতাম না।

সেই জঙ্গলে বাঁশঝাড়ের সামনের দিকে এক পড়ো পড়ো খোড়ের ঝুপরিতে থাকত এক খুথ্থুরে বুড়ি। মাথা ভরে সাদা চুলের জট। সারা গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। পরনে একফালি ট্যানা। ছানিপড়া আঁশটে চোখ। ভাঙা শিরদাঁড়া। আধখানা হয়ে লাঠি হাতে টুকটুক করে চলাফেরা করত।

পাড়ার বড়দের মুখে শুনেছি, ওর স্বামী দূরের চাষীদের গ্রামে গিয়ে পুজোআচ্চা করত। যাকে বলে পুরোহিত। তাকে অবশ্য আমরা দেখিনি। শুনেছি, এক ঝড়জলের রাতে ধানখেতের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরবার সময় মাথায় বাজ পড়ে সে মারা যায়।

পাড়ার সবাই বুড়িকে 'কালোর মা' বলে ডাকত। খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি ওকে। একসময় তকলিতে সুতা কেটে পৈতে তৈরি করত। তারপর আরো বুড়ি হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করত। তাছাড়া, পুকুরের কাছে গেলেই দেখতে পেতাম ওকে। পুকুরের হাঁটুডুব জলে দাঁড়িয়ে মাটির কলসীতে জল ভরছে কিংবা কলমী শাক তুলছে। পাড়ে ফাঁকা জায়গায় রোদ্দুরে খুঞ্চিপোষে আচার কিংবা মেটে বাসনে কাসুন্দি শুকুতে দিচ্ছে। ঘুরঘুর করছে ঝোপেঝাড়ে। আর সেইসঙ্গে অনর্গল আপনমনে বকবক করছে।

কালোর মাকে দেখলেও কালোকে আমি দেখিনি। কিংবা দেখলেও মনে নেই। দাদামশাই বলেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অর্থাৎ উনচল্লিশ সালে কালো পল্টনে নাম লিখিয়ে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে যুদ্ধ করতে যায়। তারপর কিছুদিন বাদেই আসে দুঃসংবাদ। ফ্রণ্টে কালো মারা যায় কামানের গোলার আঘাতে।

কালো ছাড়া তিনকুলে কেউ ছিল না বুড়ির। মৃত্যু-সংবাদের টেলিগ্রামটা নিয়ে আসে হরেন পিওন। হরেনের সন্দেহ হয়। টেলিগ্রামে নিশ্চয়ই কিছু দুঃসংবাদ আছে। তখন টেলিগ্রামটা নিয়ে সে যায় রমেশ চৌধুরীর কাছারিতে। রমেশ চৌধুরী আমাদের পাড়ার

সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি। শহরের নামকরা উকিল। টেলিগ্রামের খাম খুলে রমেশ চৌধুরীর তো আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ে। কি করে তিনি নিজ মুখে এরকম একটা খবর দেবেন কালোর মাকে। তখন পাড়ার বয়স্কদের ডাকলেন। সবাই মিলে ছোটখাট একটা মিটিং করল। তারপর ঠিক হল, কালোর মাকে ছেলের মৃত্যু-সংবাদ জানানো হবে না। আর ক'দিনই বা বাঁচবে বুড়ি।

বুড়ি দিনমান খোড়ো ঝুপরির দাওয়ায় হাঁ করে বসে থাকত। দিনের পর দিন। কখন কালো ফিরবে এই আশায়। রাতেও টেমি হাতে পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়াত। যাতে কালো এলে আলো ধরে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারে। ওদিক দিয়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ চাষীরা গ্রামে ফিরত। তাদের ধরত বুড়ি। শুধোত, 'হ্যাঁগো বাছা, আমার ছেলে কালো কবে যুদ্ধ থেকে ফিরবে শুনেছ কিছু?'—তারা বলত, 'না তো।'

এই ভাবে দিনের পর দিন গড়াতে লাগল। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছরও কেটে গেল। বুড়ি ক্রমশ বুড়ো হচ্ছে। শেষে মরীয়া হয়ে আমাদের পাড়ার ভেতর ঢুকে এবাড়ি সেবাড়িতে হানা দিতে লাগল। ধরত একে ওকে। বলত, 'একটা চিঠি লিখে দাও না কালোকে। লিখো, কতদিন ওকে দেখি না। মার প্রাণ তো, বুঝতেই পারছো। ছুটি নিয়ে একবার যেন আমাকে দেখে যায়। কবে চোখ বুজি।'

আশ্বাস দিত কেউ কেউ। বলত, 'ঠিক আছে লিখে দেব।'

কেউ কেউ আবার খাতা পেন্সিল নিয়ে বসত, বলত ব্যস্তসমস্ত হয়ে, 'চটপট, বলো কালোর মা, কি লিখতে হবে?'

বুড়ি উৎসাহিত হয়ে বকবক করে যেত। ছেলের জন্য তার মনে কত কথা জমে আছে। সব উজাড় করে দিত।

লেখক তো তখন সাদা পাতায় স্রেফ আঁকিবুকি কাটছে। এক-সময় বলত, 'অনেক লিখেছি কালোর মা। আর তো জায়গা নেই।'

শুনে বুড়ির মুখের নদীনালা আনন্দে নেচে উঠত। আশীর্বাদ করতে করতে চলে যেত কালোর মা।

তারপর ফের আবার কিছুদিন বাদে হানা দিত। ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো সবাইকে। বলত, 'কি হলো বাছারা, কালোর চিঠি আসছে না কেন?'

কপট ধমকে উঠত সবাই। বলত, 'যুদ্ধ যে নানান জায়গায় হচ্ছে। হয়ত কালো চিঠি পায়নি। আবার দেব'খন। এত চিন্তার কি আছে। ঘরে চলে যাও কালোর মা। চিঠি এলেই দিয়ে আসব তোমাকে।'

শেষের দিকে বুড়ি কেমন খ্যাপাটে হয়ে গিয়েছিল। শরীরটা ডোঙার মত বেঁকে গিয়েছিল। তবু লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে আসত পাড়ায়। ততদিনে বুড়িকে নিয়ে পাড়ার সবাই তিতিবিরক্ত। কার এত সময় আছে যে বুড়িকে বসিয়ে বকবক করবে। বলত সবাই, 'চিঠি আসছে না তাতে এত ভাবছ কেন তুমি। যুদ্ধ শেষ হোক। দেখো, কালো ঠিক ফিরে আসবে।'

ততদিনে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেছে। বুড়ি পাড়ার লোকের কথায় কি বুঝত কে জানে।

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে নিজের ঝুপরির দিকে ফিরে যেত। বলত ঝাপসা গলায়, 'কি যে এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে—'

শেষপর্যন্ত এক বর্ষার রাতে বুড়ি সাপের কামড়ে মারা যায়। দু'তিনদিন বাদে পাড়ার লোকেরা ওর বাসি মড়া আবিষ্কার করে ঝুপরিতে। সেই থেকে চোর-টোর ছাড়া আর কেউ পুকুরের ওধারে যেত না।

তার বছরখানেক পরের কথা। স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বড়মামা পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে আসার সময় আমার জন্য একটা ক্যাম্বিসের বল নিয়ে এসেছিল। সেদিন পাড়ার ছেলেরা মিলে পুকুরধারের মাঠে ক্রিকেট খেলতে গেছি। সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে পড়াশুনো করার তাড়া নেই। শীতের বেলা। দেখতে দেখতে চারদিক কালচে হয়ে এসেছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন এত জোরে ব্যাট চালাল যে ক্যাম্বিসের বলটা পুকুর ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ল ওধারের

জঙ্গলে। বলটা আমার। সুতরাং, ওটা খুঁজে বের করবার জন্য গরজটাও আমার; কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে বল খুঁজতে পুকুরের ওধারে যেতে রাজী হল না। বাধ্য হয়ে একাই ছুটলাম ওদিকে।

ভালুকে অন্ধকার নেমেছে। ওধারে গিয়ে আঁশস্যাওড়ার জঙ্গলের আশেপাশে বলটা খুঁজছি। ছোট বল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বলটা পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল—বাঁশঝাড়ের ওধারে ঝুপরির কাছে একটা টেমির আলো চলাফেরা করছে। ভাবলাম, বোধহয় চোরটোর ঘোরাফেরা করছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার মড়মড়ে আওয়াজ। ভয়ে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিল। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে, কে ওখানে?'

আওয়াজটা আচমকা থেমে গেল। কিন্তু আলোর চলাফেরা, চলছিল সমানেই। এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন ঝাপসা গলায় বলছে, 'কিরে, কালো ফিরে এলি নাকি বাবা?'

মুহূর্তে আমার ছ'পায়ের গোড়ালি হরিণের মত শক্ত হয়ে উঠল। বল খোঁজা মুলতুবি রেখে আমি দৌড় লাগালাম। পুকুর পাড়ে এসে পেছন ফিরে একবার তাকাতে দেখি খোড়ো ঝুপরির দাওয়ার সামনের ফাঁকা জায়গায় টেমি হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক থুরথুরে বুড়ি। বলছে, 'কে যাচ্ছ বাছা! আমার কালোর কোন খবর জানো?'

প্রাণপণে ছুটছি। মাঠ পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকে এবাড়ির ছাঁচতলা ওবাড়ির বাগান পেরিয়ে অবশেষে বাড়িতে এসে পৌছুলাম। যুদ্ধ আমি দেখি নি কখনো। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কতটুকু সত্য আর কতটুকুই বা দেখা-শোনার ভুল তা বলতে পারব না। তবে যুদ্ধ যে কত মারাত্মক, কি ভয়ঙ্কর দুঃখের সেটা সেই ছেলেবয়সেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

———